বিশিষ্টজন

আজকাল

‘ভাল আছি’

অশোক দাশগুপ্ত

২৫ মার্চ, আজকালের প্রতিষ্ঠাদিবস। ঘরোয়া অনুষ্ঠান। সবথেকে উৎসাহী কে? মৌ। ‘খেলা’ পত্রিকা আবার প্রকাশ করা হবে। সবচেয়ে উৎসাহী কে? মৌ। এবার পুজোসংখ্যা আরও ভাল করতে হবে। সবচেয়ে উৎসাহী কে? মৌ।

সেই মেয়েটাই আর নেই। থাকল না আমাদের মধ্যে। সত্যম, ঋষি— ওদের কষ্ট সীমাহীন। যারা আছি আজকালে, আমাদেরও গভীর দুঃখ। এই উটকো সাংবাদিকের মতো অতিরিক্ত সময় বেঁচে থাকলে, ঘনিষ্ঠজনদের হারানোর শোক বহন করতে হয়। তাই বলে ৫৩? মৌ?

ভাল গাইত। ভালবাসত শিল্পীদের, যাঁদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার, ভালবাসা। এত নরম মন। সেই নরম মেয়েটা আমাদের গভীর কষ্ট দিয়ে চলে গেল। কয়েকটা দিন অতন্দ্র সত্যম, ঋষি, টেকনো ও আজকালের অনেক সহযোগী। মঙ্গলবার সকালে এল অমঙ্গল-বার্তা। সকালেই সত্যমকে ফোনে সান্ত্বনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কতজন শোকাহত মুখে, হৃদয়ে হাজির, নীরব। সেই নীরবতা অনেক কথা বলতে চায়।

শেষ মেসেজ: ‘খুব খারাপ অবস্থা দাদা।’ উত্তর দিলাম, ‘দ্রুত সেরে ওঠো মৌ। পুজোসংখ্যা করতে হবে না?’ এবারও প্রকাশিত হবে পুজোসংখ্যা। শুধু মৌ থাকবে না।

রান্না করতে, খাওয়াতে ভালবাসত খুব। বলল, ঋষিও দারুণ রান্না শিখছে। এক সন্ধেয় এল ছেলেকে নিয়ে। স্পেশ্যাল ফিশ ফ্রাই বানিয়েছে ঋষি, আমাকে খাওয়াতে হবে। বললাম, ‘ফাটিয়ে দিয়েছিস রে।’ ঋষি লাজুক হাসল। মৌ-এর মুখ হাসিতে ভরে গেল।

মৌ-এর ফোনে রিংটোন ছিল, ‘আমার মল্লিকাবনে/ যখন প্রথম ধরেছে কলি’। ফোন বাজলেই ‘ধরেছে’ পর্যন্ত যেত না, তার আগেই ফোন ধরত। ‘বলুন দাদা।’ দাদা থেকে গেল। বোন চলে গেল। বোধহয় ‘মল্লিকা বনে’।

আজকালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর, হয়তো কোনও ব্যাপারে এমন কিছু বলল, যা মানা কঠিন। একটু বোঝালেই মৌ একমত। ওর মনটা যেন একমত হওয়ার জন্যই প্রস্তুত (থাকত)। পা ভেঙেছে। পুরো সারেনি, অদম্য প্রাণশক্তি, চলে গেল দার্জিলিং। ওদের ‘দ্য রিট্রিট’ হোটেল নতুন করে সাজানো হচ্ছে, ওকে যেতেই হবে। কোনও অসুস্থতার সময়ে মেসেজ করলে উত্তর আসত, প্রথম লাইন— ‘ভাল আছি।’ শেষ মেসেজ, ‘খুব খারাপ অবস্থা দাদা।’ অকাল প্রয়াণ। মৌ, একেও কি বলে ভাল থাকা, আমাদের অসীম ব্যথা দিয়ে? এখনও বলতে চাইবে— ‘ভাল আছি’?

(৮ মে আজকালে প্রকাশিত লেখা থেকে পরিবর্ধিত)

আমার মনকেমনের চিরকালের মৌ

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘আমি মরে গেলে তুমি কিন্তু কিছু লিখবে রঞ্জনদা’, এই কথাটা মৌ বেশ কয়েকবার বলেছে আমাকে। এবং ‘এটা কোনও কথা হল মৌ!’, বা এরকম কিছু হালকা কৌতুকী কথার আড়াল টেনে আমি সরে গেছি, এড়িয়ে গেছি। সত্যি কোনও দিন ভাবতে পারিনি আমি তিরাশি বছর বেঁচে থাকব, পৌঁছোব ৭ মে ২০২৪-এ, যেদিন সকালবেলা আমি পাব আমার আদ্দেক বয়সের মৌ রায়চৌধুরীর মৃত্যুসংবাদ এবং যেদিন সেই মেয়ের আদেশ, ‘আমি মরে গেলে তুমি কিন্তু কিছু লিখবে রঞ্জনদা’ আমার ওপর সত্যিই নেমে আসবে গ্রিক ট্র্যা জেডির নিয়তি-নির্ধারিত অরেকল্ বা দৈবাদেশের অনিবার্যতায়। এবং ধারণ করবে সেই অরেকল্ গ্রিক ট্র্যাজেডির আয়রনি, বা অব্যর্থ ব্যাজোক্তি! কে জানত আমার লেখা মৌ-এর ‘অবিচুয়ারি’ প্রকাশিত হবে ২৫ বৈশাখ, মৌ-এর সবথেকে ভালবাসার মানুষ, তার পুরুষোত্তমের জন্মদিনে!

লাতিন ‘অবিচুয়ারি’ শব্দটি, যার আক্ষরিক অর্থ শোকসংবাদ, আমার মোটেও পছন্দ নয়। অবশ্য আমি জানি না ‘চুয়ারি’ শব্দটির সঙ্গে সংস্কৃত ‘চারণ’ শব্দটির আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে কি নেই। মৌ কিন্তু আমার বাকি জীবনে বেঁচে থাকল আমার মনকেমনের চারণভূমি হয়ে। আমার শেষ দেখা মৌ তার অন্তিম অনন্ত নিদ্রায়। মৃত্যু তাকে জড়িয়ে আছে লাল বেনারসি হয়ে। মৃত্যু তার সারা শরীর জুড়ে রজনীগন্ধার বাগান। তার দুধে-আলতা করতল দুটি বেনারসির স্রোত আর রজনীগন্ধার বিততির ওপর মধুর মায়ায় ন্যস্ত!

আর কি কখনও কেউ বাড়িতে মাগুর মাছের ঝোল হলেই বলবে, আজ রাত্তিরে আমার বাড়িতে খাবে! তোমার পছন্দের মাগুর মাছের ঝোলভাত। কিংবা ডিমভরা সরষে-ট্যাংরা। মৌ তার রান্নায় নিয়ে আসত মর্মী ম্যাজিক। তার রান্নার সেই শৌভিকতা মিশে থাকল আমার মউল-মনকেমনে। মৌ একেবারে দেখতে পারত না আমার হুইস্কিপ্রেম। কিন্তু নিজে হাতে ভেজে দিত সেই ছাইপাঁশের সঙ্গে ভেটকির ফ্রাই। এবং ফ্রাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ভুলত না ছাইপাঁশ গেলার বকুনি। এই সব কিছু হয়ে রইল বাকি জীবন আমার মনকেমন ও বেদনার গয়না। এইসব স্মৃতি আমি না খুঁড়ে পারব না, বেদনার মাধুর্যে মৌকে ফিরে ফিরে পেতে!

মৌ আর সত্যমের শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ আবাসে বেশ কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম একবার। আর কোনও কিছু উপলক্ষে নয়, শুধু তিনজনে একসঙ্গে হব বলে। সত্যম, মৌ, আমি-আমরা তিনজনেই রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি, এইটে হয়তো আপাতভাবে একটা মিলের দিক। কিন্তু মৌ-এর রবীন্দ্রপ্রেম ছিল সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় সংশয়হীন সমর্পণ! রবীন্দ্রনাথের জন্য এইরকম প্রাণঢালা ভালবাসা আমি বাঙালির রবীন্দ্রন্যাকামি বা ভাবালুতার মধ্যে বিশেষ পাইনি। মৌ-এর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে আমি দেখেছি, মৌ রবীন্দ্রনাথের নিত্য আরাধনায় কতক্ষণ নিবিড় সময় কাটায়। আর দেখেছি জীবনের গভীর দুঃখে, কিংবা হতাশায়, কিংবা বিশুদ্ধ আনন্দে-অনুরাগে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতে। যেন এক অদৃশ্য প্রাণেশকে জানানো প্রেম ও প্রণতি একসঙ্গে, প্রতিটি পত্র! কখনও চোখের জল ঝরেছে সেই পত্রের গায়ে, এমনও দেখেছি।

মৌ ছিল গভীরভাবে ভগবানে বিশ্বাসী। এবং শ্রীকৃষ্ণ বলতে অজ্ঞান। আমি

চিরকালের সংশয়ী এবং বেশ তির্যক, কৃষ্ণভক্ত মৌকে কিছুটা নাস্তিকবাদে দীক্ষিত করতে চেয়ে মহা বেকায়দায় পড়েছি বারবার। মৌ–এর ভক্তিতে, বিশ্বাসে, প্রাণাঞ্জলিতে এতটুকু চিড় ধরাতে পারিনি। মৌ–এর সরল প্রত্যয় আমাকে বারবার গোহারান হারিয়েছে! সেই মৌ প্রতি জন্মাষ্টমীর রাত্রে নেমন্তন্ন করত আমাকে। কিন্তু আমার তো প্রসাদের সঙ্গে হুইস্কি চাই। মৌ সেই 'স্পেশ্যাল' ব্যবস্থাও রাখত আমার জন্য। এমনই ছিল মৌ–এর মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা! প্রসাদের সঙ্গে হুইস্কি মেশাচ্ছি আর মৌ তাকিয়ে দেখছে— মৌ–এর সেই দৃষ্টিও বাকি জীবন তাকাবে আমার পানে, আমার মনকেমনের চারণভূমিতে।

এই চারণভূমিতে ভেসে উঠছে একটি ছবি। গত সেপ্টেম্বরে প্যারিস থেকে সবে ফিরেছি। মৌ ডেকেছে চায়ের আড্ডায় মধুর বিকেলবেলায়। আমি বলছি প্যারিসের গল্প। এবারের প্যারিস যাওয়া কিছু স্মৃতি, কিছু ছায়া, কিছু মনকেমনের টানে। এবং কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিধ্বনিতে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্যও। কোন্ সময়ে, ঠিক একশো বছর আগে, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, যুদ্ধে আহত হয়ে আমেরিকান হয়েও এসেছেন প্যারিসে এবং লড়ছেন অফুরন্ত দারিদ্রের সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক হবেন বলে। কীভাবে তাঁর আলাপ হল, নিবিড় বন্ধুত্ব হল সিলভিয়া বিচ্–এর সঙ্গে, কীভাবে তিনি জড়িয়ে পড়লেন 'শেক্সপিয়র অ্যান্ড কোম্পানি' নামের প্যারিসে প্রথম ইংরেজি বইয়ের দোকানটার সঙ্গে— সেই গল্প থেকে শুরু করে প্যারিসে একদা সাহিত্যিকদের 'লস্ট জেনারেশন' নিয়ে নোয়েল রিলে ফিচ্–এর ধ্রুপদী গ্রন্থ। তারপর 'শেক্সপিয়র অ্যান্ড কোম্পানি' থেকে জেমস জয়েস–এর নিষিদ্ধ উপন্যাস 'ইউলিসিস' প্রকাশিত হওয়ার কাহিনি। তারপর প্যারিসের কোন্ কোন্ রেস্তোরাঁয় আর ক্যাফেতে আড্ডা দিতেন আলবের কামু, জঁ–পল সার্ত্রে, অঁদ্রে জিদ, মিলান কুন্দেরা, সেই সব জায়গার ছবি ও গল্প। এবং শেষ পর্যন্ত ১০ লিতর্ স্ট্রিটে মিলান কুন্দেরার ছাদ–বাড়ি! সব শুনল মৌ। আর বলল, অমল আদেশে, দশ দিনের মধ্যে বইটা লিখে আমাকে দাও। এবং সত্যি সেই বই মৌ প্রকাশ করল বইমেলায় 'আজকাল' থেকে। চমৎকার প্রকাশনা: 'হুইল চেয়ারে প্যারিস'। মৌ বলেছিল, তোমার সঙ্গে এবার প্যারিস যাব, তোমার চোখ দিয়ে দেখব সেই কবি–সাহিত্যিক–শিল্পীদের শহরকে।

মৌ চলে যাওয়ার পরের দিন সন্ধেবেলা গেলাম সত্যম রায়চৌধুরীর বাড়িতে। কয়েকজনের মাঝে সত্যম কী নিঃসঙ্গ, মনে হল আমার। সত্যমের সামনে, ঘরের মাঝখানে, সাদা ফুলের অপাপবিদ্ধ বাগানে রাঙা গোলাপে সাজানো মৌ, সরাসরি তাকিয়ে মৃদু হাসছে। 'তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা!' আমার কিন্তু মৌকে মুহূর্তের জন্যও মনে হল না, সুদূর নীহারিকা! মনে হল, অনুভব করছি তার ভালবাসার নৈকট্য, উদ্ভাস, উত্তাপ। 'এ যাওয়া, যাওয়া নয় মৌ। এ–এক রকমের থেকে যাওয়া', মৌকে নীরবে বলল আমার সমস্ত হৃদয়।

'দ্যাখো, কী রেখে গেছে মৌ।' সত্যম দেখাল আমাকে। একটি প্লাস্টিকের খামে সত্যমকে লেখা মৌ–এর 'উজানপত্র'। অন্য খামে সত্যমের লেখা মৌকে 'প্রাণপত্র'। পৃথিবীতে এখনও এত মায়া রয়ে গেছে! কমলকুমারের লাইনটি সামান্য ভিন্ন ভঙ্গিতে মনে এল আমার। অবাক হলুম দেখে, থরে থরে মান–অভিমান, চাওয়া–পাওয়া, যাচনা–সমর্পণ, মিলন–বিরহ, প্রতিশ্রুতি–আদর–আলিঙ্গন এবং দুজনে একসঙ্গে প্রাণের উদ্‌যাপন, কী সুঠাম সুরম্য স্মৃতির সরণিতে সাজানো! 'কখন মৌ এইভাবে দুটি অ্যালবামের মধ্যে রেখে গেছে, আমি জানতামও না!', বলল সত্যম। কান্না গড়িয়ে পড়ল তার চোখ থেকে। কী জানি কেন আমার মন বলল, এই গল্পের এখানেই শেষ নয়!

মৌ–এর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ১৫ এপ্রিল। সকাল থেকে প্রায় বিকেল পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলাম এক অনুষ্ঠানে। খাওয়াদাওয়া, গল্প, আড্ডা। থাইল্যান্ডের পেয়ারা খেলাম দু'জনে। বুঝতে পারছিলাম শরীরটা মৌ–এর খুব ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু মৌকে দেখলাম, সত্যমের পরিশ্রম ও শরীর নিয়েই যেন বেশি চিন্তিত। কে জানত তখন, ওর নিজের জীবনের আর মাত্র বিশ–বাইশ দিন বাকি!

মৃত্যু যে মৌ–এর এত কাছাকাছি এসে অপেক্ষমান, বিন্দুমাত্র টের পাইনি ১৫ এপ্রিল। ৭ মে ভোরবেলা খবরটা পেলাম। কেমন যেন দিশাহারা মনে হল নিজেকে। একরাশ কান্না এল ভেতর থেকে— বেদনা যেন ছিটকে বেরিয়ে এল চোখের জল হয়ে।

চিরদিন রয়ে যাবে

যোগেন চৌধুরী

'মৌ' বলে ডাকতাম, নাম মৌ রায়চৌধুরী। এই নামেই সে সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমার সঙ্গে সত্যম এবং তার সহধর্মিণী মৌ দীর্ঘদিন থেকে পরিচিত। অন্তত ১৫–২০ বছর, বা তার বেশিই হবে। সেই সময় থেকেই ওদের সল্টলেকের বাড়িতে বহুবার গিয়েছি। খাওয়াদাওয়া হত, নানা বিষয় নিয়ে গল্প হত। বিশেষ করে সত্যম কীভাবে একটি ছোট্ট জায়গায় অল্প কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল হোম শুরু করেছিল এবং ক্রমশ যা একটি বিশাল সংস্থা, অর্থাৎ বর্তমান টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে পরিণত হয়েছে। আজ সেই থেকে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি ছাড়াও আরও অসংখ্য টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউশন, পাবলিক স্কুল, এমনকী হাসপাতাল, হোটেল ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। এই সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে মৌ-ও অবশ্যই ঘনিষ্ঠভাবে একজন সংগঠক হিসেবে যুক্ত থেকেছে, তা বলাই বাহুল্য। একটি কথা বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃতিচর্চা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই মৌ ও সত্যমকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। প্রতি বছরের মতো এবারও মৌ ও সত্যম সপরিবারে তাদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে বসন্তোৎসব পালন করল। মৌ-এর আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি। আজ ভেবে মনখারাপ লাগছে, এরপর আর মৌ-কে আমরা কখনও মুখোমুখি দেখতে পাব না। শুধু আমাদের মনের স্মৃতিকোঠায় মৌ চিরদিনের জন্য রয়ে যাবে।

সুগন্ধভরা ফুল হঠাৎ ঝড়ে ঝরে গেল...

শুভাপ্রসন্ন

সত্যম রায়চৌধুরীর যে বিশাল সাম্রাজ্য, সেই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিল মৌ রায়চৌধুরী। এরকম হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল নারী খুবই বিরল। তাকে ভাল না বেসে এড়িয়ে যাওয়া যেত না। মৌ বাইরের মহল ও অন্তরমহল, দুই-ই সামলাত। সত্যমের সংস্কৃতিমনস্কতা সর্বজনবিদিত। সেই সত্যমের অর্ধাঙ্গিনী ছিল মৌ, সর্ব অর্থে। মঞ্চে গান গাইছে সত্যম, মৌ-ও গান গেয়ে চলেছে। হয়তো ব্যস্ত থাকার কারণে ফোন ধরতে পারেনি, পরক্ষণেই ফোন করেছে। সেই মৌ যে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, তা ভাবাও যায় না। একটা ফুটন্ত সুগন্ধভরা ফুল যেন হঠাৎ ঝড়ে ঝরে গেল। অজস্র কর্মচারী, সহযোগী মানুষের কাছে মৌ ছিল প্রিয় বউদি। আর্টস একর-এ কোনও অনুষ্ঠানে বহু মানুষ আমন্ত্রিত, তাদের কী খাওয়াদাওয়া অর্থাৎ মেনু কী হবে, মৌ তার সমস্ত বর্ণনায় বুঝিয়ে দিত। কোনও কিছুই তার চোখের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। অসংখ্য ভাই, দিদির হাত থেকে ফোঁটা নেওয়ার লাইন পড়ে যেত। প্রতিটি ভাইকে যত্ন করে ফোঁটা দিত মৌ। যে কোনও গুণিজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত। এসব তো একদিক, অন্যদিকে আজকাল প্রকাশনা থেকে মাসিক তিনটে অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা সুষ্ঠু সুন্দর করে সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল তার। একদিকে যেমন গুণী, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের মতামত নিয়ে 'সুস্থ' নামের পত্রিকা, অন্যদিকে মানুষ কোথায় বেড়াতে যাবে সেই নিয়ে ভ্রমণ বিষয়ক জার্নাল 'সফর', আর খেলাধুলা বিষয়ে পত্রিকা 'খেলা'— এই তিনটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা নিয়মিত সম্পাদনার দায়িত্বে ছিল মৌ রায়চৌধুরী। আমার মনে আছে, বসন্ত চৌধুরির বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম। মৌ সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যায়। মৌ-কে কখনও আমি রাগতে দেখিনি। ওই মুখে রাগ মানাত না, অভিমান থাকত কখনও কখনও। তাই সেই আটপৌরে, ঘরোয়া, কারও ননদ, কারও জা এই বিরল মিষ্টি মানুষটি হারিয়ে যায়নি। আমাদের স্মৃতিতে, পরশে চিরকালীন হয়ে থাকবে মৌ, এ বিশ্বাস রাখি।

ক্যালকাটা ক্লাব থেকে বিদেশ, কত স্মৃতি...

শ্রাবণী সেন

মৌ–এর সঙ্গে পরিচয় বহুদিন আগে থেকে। এক অনুষ্ঠানে প্রথম সাক্ষাৎ। দেখেই মনে হয়েছিল নিজের বোনের মতো। এত আপন করে নিয়েছিল প্রথম দেখাতেই। সল্টলেকে ওদের বাড়ির কাছেই এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম একবার। টানতে টানতে দু'জনেই নিয়ে গেল বাড়িতে। তখনই বলেছিল, 'শ্রাবণীদি, আমাকে একটু গান শেখাবে?' বলেছিলাম, এত দূর থেকে এসে গান শেখানো তো মুশকিল, যেতে পারলে... নানা কাজে ব্যস্ত থাকত সারাক্ষণ। আমার কাছে একজন গাড়ি চালাত। অমিত। এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আমি ওকে বাঁচাতে পারিনি। কিন্তু সেই সময় নিউরোসায়েন্সে বড় পরিমাণের খরচ হয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, বলার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা পাঠিয়েছিল। কাজ করে যেত চুপিসারে। কত স্মৃতি। ক্যালকাটা ক্লাবে একসঙ্গে অনুষ্ঠান, বিদেশের অনুষ্ঠান। আমাদের সবসময় খুব উৎসাহিত করত। প্রতিদিন হয়তো দেখা হত না, কিন্তু ওকে বড় ভালবাসতাম।

আমার জন্মদিন... এসো

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়

মৌ। নামটার মধ্যেই একটা মিষ্টত্ব লুকিয়ে। একটা সারল্য লুকিয়ে। তবে শুধু নামে নয়, আদপেই ও তেমনই ছিল। মিষ্টি–সাদাসিধে–ঘরোয়া একটি মেয়ে।

মনে আছে, সেবার চুঁচুড়া টেকনো ইন্ডিয়ার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছি। ভিড়। ব্যস্ততা। তার মধ্যেই খেয়াল করলাম মৌ–কে। সবার মধ্যে থেকেও ও আলাদা করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। জানলাম, ও সত্যমের স্ত্রী। সত্যমের সঙ্গে কর্মসূত্রে এর অনেক আগেই আলাপ। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সেই আলাপের শুরু।

তারপর শুরুর সেই আলাপ কেমন অনায়াসে বদলে গেল বন্ধুত্বে। সম্পর্কে।

ওর যে দিকটি আমায় সবচেয়ে বেশি টানত, তা হল ওর আটপৌরে স্বভাব। সকলের মধ্যে মিশে যাওয়ার অভ্যেস। কারও সঙ্গে কথা বললেই যেমন একটা প্রশান্তি আসে, কারও হাসি, উচ্চারণ সবেতেই যেমন মায়া জড়ানো থাকে, মৌ–ও ঠিক তেমনই।

ওদের বাড়ি গেলেই, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে ও। হয়তো একটা ডাক দিলেই দশজন সাহায্যকারী চলে আসবেন, কিন্তু তবু নিজের হাতে সব কিছু প্রস্তুত করবে ও। তাতেই ওর আনন্দ। ওর তৃপ্তি।

ওদেরই কোনও অনুষ্ঠান করে ফিরেছি, তারপর ও ঠিক মনে করে একটি শাড়ি উপহার পাঠাবে আমাকে। প্যাকেট খুলে দেখতাম, আমার যেমনটা পছন্দ, ঠিক তেমনটাই ও পাঠাত। মৌ, তুমি কি মন পড়তে পারো?

হয়তো তা–ই, নইলে কী ভাবেই বা এত সহজে কারও মা, কারও দিদি, কারও বন্ধু হয়ে উঠলে তুমি!

রবীন্দ্রপ্রেমী মৌ। ওর গান শুনেছি বেশ কয়েকবার। ওর লেখাও পড়েছি। আর নিয়তির কী অদ্ভুত পরিহাস, ২৪ বৈশাখই ওকে চলে যেতে হল। পঁচিশে বৈশাখ যখন শহরের নানা প্রান্তে ঘুরেছি, জানো, বারবার মনে পড়েছে তোমায়। মনে পড়েছে তোমার হাসিটা।

বছর দুই আগে, হঠাৎ একদিন আমাকে ফোন করল মৌ। বলল, আমার বহু দেশে কবিতা সফরের একটা লেখা নাকি ‘আজকাল’ শারদ পত্রিকায় দিতেই হবে। আমি খানিকটা হতভম্ব! পারব তো? আশ্বাস দিল মৌ, পারব।

আশ্বাস অবশ্য আরও বিভিন্ন সময়ে ও দিয়েছে। গাইনিকোলজিক্যাল কিছু জটিলতা বিষয়ে একটা পর্বে দীর্ঘ আলোচনা হত ওর সঙ্গে। কোন্ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কী করা যেতে পারে— নিকট আত্মীয়ের মতো পরামর্শ দিয়ে যেত মৌ।

মাস কয়েক আগে আমি তখন কাশ্মীরে ঘুরছি। ভূস্বর্গ ভ্রমণের মাঝেই ওর মেসেজ।

‘আমার জন্মদিন... এসো’

কাশ্মীরে থাকার জন্য, যাওয়া হয়নি।

মৌ, তোমার খবরটা পেয়েই ইনবক্সটা খুললাম আবার। ওটাই আমাদের শেষ কথা। কিন্তু শেষ কি সত্যি সত্যি? না বোধহয়, মনে মনে, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রইল। কোনও সমস্যায় পড়লেই পরামর্শ চাইব। দেবে তো?

ভাল থেকো!

—তোমার ব্রততীদি।

জোরে কথা বলতেনই না

গৌতম ঘোষ

কিছুদিন আগেই দেখা হয়েছিল মৌ রায়চৌধুরীর সঙ্গে। তখনও তাঁর আবদার ছিল, ‘আমার সঙ্গে আরও একটা ছবি করবেন তো?’ জানিয়েছিলাম, বিদেশি ছবির কাজে ব্যস্ত। তবে নিশ্চয়ই আবার মৌ রায়চৌধুরীর প্রযোজনায় ছবি বানাব। সংসার, অফিসের কাজ সামলে সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। সারাক্ষণ হাসিমুখ। ওঁর থেকে জোরে কথা বোধহয় কেউ শোনেনি। ওঁর অধীনস্থ কর্মীরাও নন। এমন মানুষদেরই সমাজের বেশি প্রয়োজন। আবার ঈশ্বরের কাছেও এঁরাই জরুরি। তাই বোধহয় এত তাড়াতাড়ি ডাক পাঠালেন।

গৌতম ঘোষ পরিচালিত ‘শঙ্খচিল’ ছবির অন্যতম প্রযোজক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার নিচ্ছেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে

এমন প্রযোজক আর কি হবে?

সন্দীপ রায়

প্রযোজক শিক্ষিত হলে সেই ছবি যে কত মসৃণ গতিতে তৈরি হতে পারে সেটা মৌ-কে দেখে শিখেছি। অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত, নম্র। নীচু গলায় কথা বলতেন। আর ভীষণ জানার আগ্রহ। প্রযোজক মৌ আমার থেকে খুঁটিয়ে সব কিছু শিখেছিলেন। তারপর সেই জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছিলেন দুই মলাটের পাতায়। ভাল প্রযোজক হতে গেলে আরও একটা গুণ থাকতে হয়। সবার আগে টেকনিশিয়ানদের মন জয় করতে হয়। ওঁরা সহজে সন্তুষ্ট হন না। মৌ সেটাও হাসিমুখে পেরেছিলেন। কলাকুশলীরা পর্যন্ত ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ! সেটে এসে সবার খোঁজ নিতেন। নিজে দাঁড়িয়ে সব ব্যবস্থা করতেন। এমন প্রযোজক আর কি হবে?

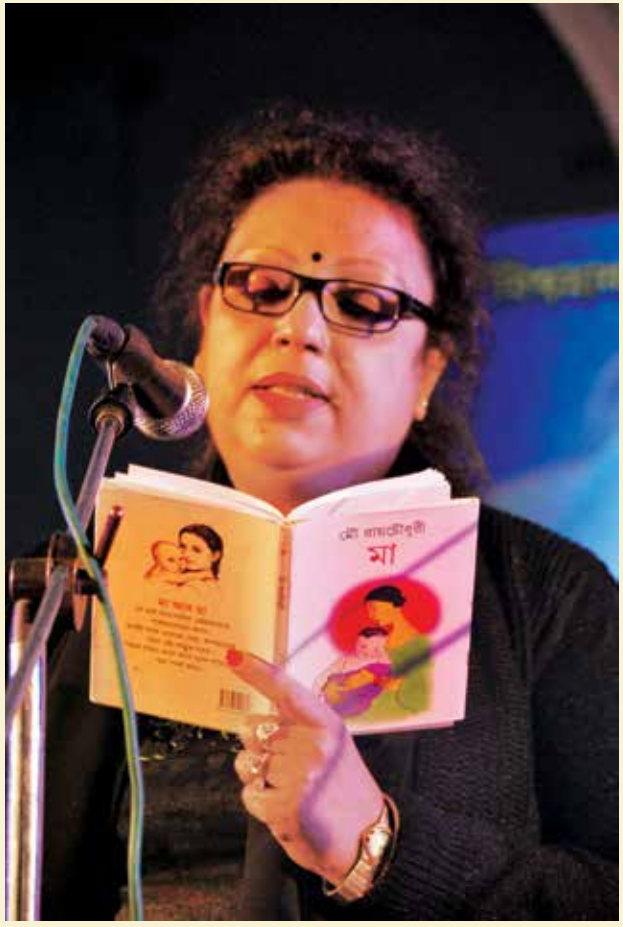

একথা বলতে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি

মনোময় ভট্টাচার্য

মৌ রায়চৌধুরী সম্পর্কে একদিন এভাবে বলতে হবে, এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। সদাহাস্য, উপকারী একজন শুভাকাঙ্ক্ষীকে হারালাম। এত ভাল একজন মানুষ। এক্ষেত্রে একটা কথা বলি, অনেক সময় ভদ্রতার খাতিরে অনেককে 'ভাল মানুষ' বলতে হয়। কিন্তু মন থেকে বলছি, মৌ–এর মতো মানুষ খুব কম হয়। এত ভাল মানুষ ছিল বলেই হয়তো আগে চলে গেল। ওর চলে যাওয়াটা আমাদের মতো মানুষের জন্য খুব দুর্ভাগ্যজনক। সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে ওর যে যোগাযোগ ছিল, তার সঙ্গেই এতগুলো দায়িত্ব পালন করত সুন্দরভাবে। আমার মনে আছে, যখনই কোনও দরকারে ফোন করেছি, কখনও নিরাশ করেনি। সবথেকে বড় কথা, এখনকার দিনে আমরা এই যে দ্রুত ছুটছি, তাতে অনেক কিছু ভুলে যাই। কখনও কখনও এমন হয়েছে, মৌ আমার ফোন ধরতে পারেনি, কিন্তু ঘুরিয়ে ফোন করতে কখনও ভোলেনি। তার মুখের মধ্যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রশান্তি ছিল। তাকে এভাবে চলে যেতে হল, এ বড় কষ্টের আমার কাছে। এই তো ক'দিন আগে গীতাঞ্জলির অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসদনে কতক্ষণ গল্প হল। নিজেও ভাল গান গাইত, সঙ্গীতানুরাগী ছিল। নতুন শিল্পীদের দিকে নজর ছিল। ওর মনে অনেক পরিকল্পনা ছিল আগামী দিনে ভাল কিছু করার। সে–সব আর হল না। মৌ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, এখনও আমি এটা ভাবতে পারি না। মৌ কি সত্যি চলে গেছে?

মনে হয় না।

মায়ের মতো করে আর কে আগলাবে?

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

বয়সে ছোট হলে কী হবে, আমার মায়ের জায়গা দখল করে নিয়েছিল মৌ। নিজে মাছ খেত না। আমি মাছ খেতে ভালবাসি। তাই আমার জন্য রাঁধত। আমি কলকাতায় এলে ওদের বাড়িতে আসবই। তখন সত্যম (রায়চৌধুরী) নিজে বাজার থেকে চিংড়ি মাছ, পছন্দের সামুদ্রিক মাছ কিনে আনত। আর মৌ নিজে হাতে রান্না করত। ওর হাতের লাউ–চিংড়ির স্বাদ জীবনে ভুলব না। আমার মায়ের পরে ওই একজনের হাতের রান্না চেটেপুটে খেতাম। তাই কলকাতায় আসার আগে রীতিমতো আবদার জানিয়ে রাখতাম, কী কী খাব। মুম্বইয়ের বাড়িতে এখন যা যা বাঙালি রান্না হয় তার সব ক'টা মেনু মৌয়ের থেকে শিখেছে আমার স্ত্রী। কারণ, ও পাঞ্জাবি। কলকাতায় আমার 'অলিখিত অভিভাবক' মৌ রায়চৌধুরী। শহরে কেবল পা রাখতাম। থাকা–খাওয়া, গাড়ি, গাড়ির চালক ঠিক করার সব দায়িত্ব আজকাল দৈনিকের ডিরেক্টর নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিত। হোটেলে রান্না করা খাবার পাঠাত। একবার টানা কয়েক দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সেই সময় নিজের হাতে পটল দিয়ে পাতলা ঝোল রান্না করে খাওয়াত রোজ। ও জানত, কী করে মানুষকে ভালবাসতে হয়। নিজের চোখে দেখেছি, কী করে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে সংস্থার। সবটাই হয়েছে আন্তরিকতা এবং মানুষকে ভালবাসার জন্য। আমার প্রতিটি গান সবার আগে শুনত। শুনে প্রশংসা জানাতে ফোন করত। যতই শরীর অসুস্থ থাক, অভিজিতের অনুষ্ঠান মানেই প্রথম সারিতে বসা মৌ রায়চৌধুরী।

দুর্গাপুজোয় ছেলে ঋষিকে নিয়ে মুম্বইয়ে সপরিবার আসত। নিয়মিত আমার খোঁজ নিত। অত্যন্ত স্নেহ করত সবাইকে। শুধু আমাকে নয়, যার সঙ্গে পরিচয় হত তাকেই। মৌ তো সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল। হারালাম তো আমি। কলকাতায় পা রাখলে মায়ের মতো করে আর কে আমায় আগলাবে?

আমার কাছে হারিয়ে ফেলা মা

গার্গী রায়চৌধুরী

খুব কাছের মানুষকে হারানোর যন্ত্রণা এই প্রথম অনুভব করছি। অনেক ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। তখনও আপনজনের বিয়োগব্যথা কী, বুঝতে শিখিনি। মৌ রায়চৌধুরী আমার কাছে সেই হারিয়ে ফেলা মা। কোনওদিন আমার জন্মদিন ভোলেননি। স্নেহের ডাকে কখন যেন তুমি, তুই হয়ে গিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, এতটা না জড়ালেও বোধহয় ভাল ছিল। তা হলে নতুন করে আজ আবার মাতৃহারা হতাম না। পেশা এবং পারিবারিক জীবনে মৌ রায়চৌধুরীর একটাই মন্ত্র, ভালবাসা। একই সঙ্গে অত্যন্ত স্বচ্ছ মনের মানুষ। যিনি ভালবাসতেন উজাড় করে, অভিমান-অনুযোগও জানাতেন একই ভাবে। পরক্ষণেই সব ভুলে কাছে টেনে নিতেন। এরকম মানুষকে ভাল না বেসে পারা যায়! এবং এমন মানুষের জন্যই সারাক্ষণ 'হারাই হারাই' ভয় কাজ করে। আবার পরোক্ষে থেকে এঁরাই শোক সামলানোর ক্ষমতা জোগান। কেবল এঁরা সামনে থাকেন না।

দাদা শুনছে, বোন চলে গেল

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

মৌ আমার বোন। অনেকটাই ছোট। দাদা শুনছে, বোন চলে গেল। দাদা কী বলবে? বলার মতো অবস্থায় আদৌ কি সেই দাদা থাকে? আমারও ঠিক সেই অবস্থা। এই শোক কথায় প্রকাশ করে বোঝানোর মতো নয়। সব চলে যাওয়া নিয়ে বলা যায় না, বলতে নেই।

এমন আন্তরিকতা আর কোথায় পাব?

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

ভীষণ প্রাণবন্ত, হাসিখুশি একজন মানুষ। সত্যম রায়চৌধুরীর যোগ্য দোসর। সবাইকে নিয়ে চলতেন। সবাইকে নিয়ে চলতে ভালবাসতেন। হইহুল্লোড়, খাওয়াদাওয়া— পোশাকি পরিচয়ের বাইরে এটাই মৌদি। শহরে আসলেই ওঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ বাঁধা। দেখা হলেই বলতেন, 'ঋতু আমার ছবিতে অভিনয় করবে তো?' সিঙ্গাপুরের বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। সেখানেও তিনি মাতিয়ে রাখতেন। যেমন বিদূষী তেমনই সুন্দরী। ঠিক যেন দেবী প্রতিমার মতো। এবং সেই সৌন্দর্য যতটা বাহ্যিক ততটাই অন্তরের। এমন মানুষ চলে গেলে তাই বুকের ভিতর খাঁ খাঁ করে। এমন আন্তরিকতা আর কোথায় পাব?

প্রযোজিত ছবির তালিকা বোঝায়, রুচি কত সূক্ষ্ম

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

টলিউডে হয়তো প্রযোজকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষিত, বিনয়ী, আন্তরিক প্রযোজকের বড়ই অভাব। এটাই ছিলেন মৌ রায়চৌধুরী। তাঁর ঝুলিতে যেমন একমুঠো ছবি। তার মধ্যে 'শঙ্খচিল' জাতীয় পুরস্কারজয়ী। তেমনই ঝুলিতে নানা স্বাদের প্রকাশিত বই। এমন বিরল প্রযোজক কোথায় মেলে? এবং মৌ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ছবির তালিকা দেখলেই বোঝা যায়, তাঁর রুচি কত সূক্ষ্ম। একজন মানুষ উন্নতির শিখরে বসেও কতটা মাটির কাছাকাছি থাকতেন সেটা ওঁকে দেখে বুঝতাম। কারও সঙ্গে আলাপ হলে তিনি আজীবন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গিয়েছেন।

এভাবে আমার কাজের আর কে প্রশংসা করবেন?

টোটা রায়চৌধুরি

আমার ছবির প্রযোজক মৌ বউদি। সেটা প্রথম পরিচয়। অসম্ভব ভাল মানুষ। সংস্কৃতিমনস্ক, শিক্ষিত। বই পড়তে ভালবাসেন, পড়াতেও। আমার সব কাজ দেখতেন। আমি 'ফেলুদা'। প্রচণ্ড খুশি হয়ে ফোন করে ফেললেন। জানালেন, এতদিনে মনের মতো ফেলুদা পাওয়া গিয়েছে। 'শ্রীময়ী' ধারাবাহিকের সময়ও ফোন, 'কী ভাল লাগছে তোমায়!' করণ জোহরের 'রকি ঔর রানি কি প্রেম কহানি' দেখেও একই কাজ। প্রশংসা করতে উদারতা লাগে। হৃদয়ের উষ্ণতা লাগে। আজকের দিনে যা বিরল। মৌ বউদি চলে গেলেন। এভাবে আমার কাজের আর কে প্রশংসা করবেন?

আমার বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠক হারালাম

ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়

ছবি, অভিনয় নিয়ে কোনও দিনই আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়নি। যাবতীয় কথা সাহিত্য নিয়ে। আমার লেখা বই ঘিরে। প্রত্যেকটা বই খুঁটিয়ে পড়তেন। প্রত্যেকটা বই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। ছোট মেয়ের মতো কত প্রশ্ন করতেন। মৌদির সঙ্গে আমার আদানপ্রদান এমনই। ওঁর প্রয়াণ মানে আমার এক একনিষ্ঠ পাঠককে হারালাম। শুটিংয়ের কারণে শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিলাম। শেষ দেখাও দেখতে পেলাম না। সারা জীবন এই আক্ষেপ আমাকে কুরে কুরে খাবে। আমাকে নিজের লেখা কবিতার বইও উপহার দিয়েছেন। আবদার করেছিলেন, আগামী বইমেলায় যেন আজকাল প্রকাশনার জন্য কলম ধরি। 'আলোর উপত্যকা' পড়ে আমার সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়ার সাধ জেগেছিল একটি বইয়ে লিখেছিলাম, ঈশ্বরও মাঝেমধ্যে ভুল করেন। কথাটা খুব পছন্দ ছিল দিদির। আমায় বলেছিলেন, কী করে এই বিষয়টি উপলব্ধি করলাম! আজ মনে হচ্ছে, খুব ভুল লিখিনি। মৌদির বেলায় ঈশ্বরের হিসেবনিকেশে সত্যিই বড় ভুল থেকে গেল।

সমবয়সি আমরা, চলে যাওয়ার মতো বয়সই নয়

বাবুল সুপ্রিয়

আমার বাবা ৮৬। রোজ রাত আড়াইটে–তিনটেতে ফোন করেও বাবার খবর নিতেন, ‘কাকু তুমি কেমন আছ? শরীর ভাল আছে তো?’ এমন মনের একজন মানুষ রাতারাতি নেই! ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। মনে পড়ছে, কলকাতায় এলে খুব কম বাড়িতে যেতাম। মৌ রায়চৌধুরীর কাছে অবারিত দ্বার। যাওয়ার আগে পছন্দের মেনু জানিয়ে রীতিমতো আবদার জুড়তাম, পোস্ত, চিংড়ি মাছ, মাংস খাব বলে। ভাল খেলা হলেই বাবাকে টিকিট পাঠিয়ে দিতেন। শুধু পাঠিয়েই থেমে থাকতেন না। ফোন করে জানাতেন, তাঁর কাকু যেন অবশ্যই খেলা দেখতে যায়। দিন কয়েক আগে একই ভাবে খেলার টিকিট পাঠিয়েছিলেন বাবাকে। পাঠিয়ে ফোন, ‘কাকু যেও। তোমার ভাল লাগবে।’ বাবা পাল্টা বলল, ‘তুমি যাবে? তোমার সঙ্গে বসে দেখলে আরও ভাল লাগবে।’ তখনই মৌ জানিয়েছিলেন, ওঁর শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না।

প্রশংসা করতে প্রচণ্ড ভালবাসতেন তিনি। যতবার ‘চাঁদের বাড়ি’ দেখেছেন, ততবার ফোন করেছেন। সমবয়সি আমরা। চলে যাওয়ার মতো বয়সই নয়। আমায় ফোঁটা দিতেন। পরিবারের সবকিছু খুঁটিয়ে জানতেন। এরকম একজনের চলে যাওয়া আমাদের সবার পক্ষে ক্ষতির।

বউমণির শাড়ি পরেই অনুষ্ঠানে যেতাম

ইমন চক্রবর্তী

আমি ওর ছোট বোনের মতোই ছিলাম বলে আমার ধারণা। সল্টলেকে অনুষ্ঠান থাকলে বউমণির বাড়িতে চলে আসতাম। তখন আমি লিলুয়া থেকে যাতায়াত করতাম। বউমণির বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে, বউমণির শাড়ি পরেই অনুষ্ঠানে যেতাম। এমনকী ওর মেক-আপও ব্যবহার করেছি। একসঙ্গে অনেক বিদেশ ট্রিপে গিয়েছি। সত্যমদাকে দাদার চোখেই দেখি, সেই থেকেই বউমণি বলে ডাকা শুরু। আমার দেখাদেখি বন্ধুরাও ওই নামে ডাকতে শুরু করে। এই খবরটা আমাকে অসাড় করে দিয়েছে। অবিশ্বাস্য! আমার বসন্ত উৎসবে প্রত্যেকটা বছর খুব আন্তরিক ভাবে পাশে থেকেছে বউমণি। আমার বিয়েতেও এসেছিল। গত পয়লা বৈশাখেও কথা হয়েছে। প্ল্যান হচ্ছিল যে, আমার বাড়িতে আড্ডা হবে। কী যে হয়ে গেল... মেনে নিতে পারছি না।

ভাইফোঁটা বা রাখি, তত্ত্ব পাঠাতেন

স্বপ্নিল সজীব

বউদি আমাদের প্রাণের একটি জায়গায় ছিলেন, আছেন, থাকবেন। কত কিছু মনে পড়ছে। সেই ২০১৫ সাল থেকে কতবার দেখা হয়েছে। ঢাকাতেও এসেছিলেন, জামদানি ভালবাসতেন। ভাইফোঁটা হোক বা রাখি, কলকাতা থেকে একজন মানুষই আমাকে তত্ত্ব পাঠাতেন, তিনি হলেন মৌ বউদি। তিনি চলে গিয়েছেন, কিন্তু আমাদের ভালবাসায়, শ্রদ্ধায় আজীবন থাকবেন।

মেসেজ আসত, ‘জিতিয়ে ফিরো’

জয় সরকার

আমি আর লোপা মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। খেলা দেখতে যাওয়ার আগে ওর মেসেজ আসত, মোহনবাগানকে জিতিয়ে ফিরো। জানিয়েছিল, হাসপাতালে আছে। রবিবার দিন খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। মেসেজের উত্তর পাইনি। চিন্তা হচ্ছিল। তারপরই এই খবর। কোনও স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না। এত প্রাণোচ্ছল একটা মানুষ, সবার সঙ্গে হেসে কথা বলা— আমি ভাবতেই পারছি না, এরকম একটা মানুষকে ছাড়া বাকি জীবনটা কাটাতে হবে!

দিয়েছ, বিনিময়ে চাওনি কিছু... কোনওদিন

লোপামুদ্রা মিত্র

মৌ হাসিমুখে চলে গেলে, কিন্তু, তোমার চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছি না যে! প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতাম আমরা। তুমি জানতে, বুঝতে, আমি কী ভালবাসি, কী বাসি না। কতদিন থেকে যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি তোমাদের বাড়ি। আমার আর জয়ের মতো সকলের মনেরই এখন এই অবস্থা, যারা তোমাকে একটু কাছ থেকে দেখেছে, বুঝেছে। তোমার মতো মনের জোর আর পজিটিভ শক্তির মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। আমার মা ছিলেন, আর তুমি। সকলকে আগলে রাখার আরেকজন মানুষ। তুমি মনের মাঝে থাকবে আমাদের। আমাদের ‘সহজ পরব’ও একজন কাছের মানুষকে হারাল। দিয়েছ, বিনিময়ে চাওনি কিছু, কোনওদিন। কে পারে? এভাবে?

আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার মিলন

নবকুমার বসু

কর্মবীর স্বামী সত্যমের পাশাপাশি মৌ প্রকৃতই তাঁর ছায়াসঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আর সেই ক্ষেত্র যে শুধুমাত্র টেকনো ইন্ডিয়ার শাখাপ্রশাখা, এসএনইউ এবং আজকাল পত্রিকা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পশ্চিমবঙ্গবাসী তা জানেন। আমরা জানতাম, রায়চৌধুরী পরিবারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডেই মৌ–এর ছিল অবাধ অংশগ্রহণ।

আর ঠিক সেই কারণেই গত ৭ মে আমার এই সুদূর প্রবাসে অশান্ত বসন্তের সকালবেলা (দেশে তখন বিকেল) অবিশ্বাসী দুঃসংবাদটা ফেসবুক–এ দেখামাত্র একই সঙ্গে স্তব্ধতার ধাক্কা এবং দোলাচলে দুলেছিলাম। কেন না, মৌ–এর সঙ্গে কথা হয়েছিল মাত্র ক'দিন আগেই যে! জানতাম দুঃসংবাদ সাধারণত মিথ্যা হয় না, তবু। কী করব? আমাদের আর কিচ্ছু করার নেই এখনই। হয়তো থাকবে কিছু পরে।

মৌ মানুষ হিসেবে কতটা আন্তরিক, মিশুকে, স্নেহশীলা, ঘরোয়া, বন্ধুবৎসল, পারিবারিক উদার, কিংবা আতিথেয়তার ক্ষেত্রে কতটা সুগৃহিণী, অথবা ম্যাডাম হিসেবে কতটা দক্ষ প্রশাসক ছিলেন কিংবা ছিলেন না, তাই নিয়ে কিছু চর্চা হবে এখন। সেটাই তো স্বাভাবিক। কেন না, মৌ শুধু বড় পরিবারের বধূ ছিলেন তা–ই নয়, বহুজনের আরাধ্য কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। আবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য প্রতিযোগিতার টানাপোড়েনেও কখনও বিব্রত ও দীর্ণ হলেও, নির্মল হাসিটি কোনও দিন ফুরোতে দেখিনি। আজকাল শারদসংখ্যা প্রকাশ বা আজকাল প্রকাশন সংস্থা কিংবা চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে, খুব বিরল আলাপচারিতার সুযোগে মনে হয়েছিল, একই সঙ্গে আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার সহজ এবং স্বাভাবিক প্রয়োগ ও মিশ্রণে মৌ একটি বিস্তৃত নিজস্ব ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই শূন্যতাকে এবার ভরাট করতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তার শ্রীবৃদ্ধি হলে মৌ–এর উজ্জ্বল হাসিমুখটিও চিরস্থায়ী হবে।

‘তুমি আমাকে গান শেখাবে?’

হৈমন্তী শুক্লা

ওর আর সত্যমের সঙ্গে বহু দিনের আলাপ। সত্যম আমাকে নিজের দিদি মনে করে। মাঝে মাঝেই ওদের বাড়িতে যেতাম। গানবাজনা হত। মৌ সবসময় গানের কথা বলত। মান্নাদার কথা গল্প করত। চুঁচুড়ার কথা বলত। আমি মান্নাদার খুব কাছের বলে এসব কথাই ঘুরে-ঘুরে আসত। মৌ এত মিষ্টি একটা মেয়ে, এত আন্তরিক ব্যবহার। ওকে এক মুহূর্ত ভোলা যাচ্ছে না। বারবার ভাবছি, ‘কী হল এটা? কেন হল?’ এই তো ক’দিন আগেই ওদের একটা অনুষ্ঠানে গেলাম। কোনও অনুষ্ঠান হলেই আগে বলত, ‘দিদির নাম লেখো।’ আমি বলতাম, ‘প্রতিবার কেন ডাকিস রে?’ বলত, ‘তুমি না এলে জমে না।’ সেই শুরু থেকে গিয়ে বসে থাকতাম। শেষ হলে ছাড় মিলত। আমি একবার গান গাইতে বললাম। বলে, ‘তোমার সামনে গাইব না।’ বড় ভাল গাইল। বললাম, ‘এত মিষ্টি, সুরেলা গলা, গানটা ভাল করে গাস না কেন?’ হাত দুটো ধরে বলল, ‘তুমি আমাকে একটু গান শেখাবে?’

আমি তো রাজি। সত্যমও বলল, ‘আমার আপত্তি নেই কিছুতেই। যাও, গান শেখো দিদির কাছে গিয়ে।’ সে-সব কিছুই হল না। শিক্ষিত, রুচিশীল একটা মেয়ে। এত সুন্দর সুন্দর পত্রিকাগুলো বের করছে। কী একটা হয়ে গেল! মনমেজাজ খারাপ হয়ে আছে। মৌ-কে কত ভালবাসতাম।

রাজ্যপাট পড়ে রইল, রানি চলল অমৃতলোকের পথে...

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

আমি মনে করি, ব্যক্তিগত কষ্ট, আনন্দ, যা আমার একান্ত আপন, তা আমারই অন্দরে সযত্নে লালিত থাক। ৭ মে আমার বাবার মৃত্যুদিন। ২০ বছরে সময় প্রলেপের পর প্রলেপ দিয়ে শোকের তাপ খানিক প্রশমিত করলেও বুড়বুড়িয়ে ওঠে কত স্মৃতি। একই দিনে চলে গেল মৌ (রায়চৌধুরী)। বছরে চার থেকে পাঁচবার মৌ–এর মেসেজ অথবা ফোন পেতাম, 'ছোট করে অনুষ্ঠান করছি বউদি, প্লিজ এসো কিন্তু।' সেটা ওর জন্মদিন হোক কী ছেলের জন্মদিন, কিংবা ওদের বিয়ের তারিখ অথবা সত্যমভাইয়ের জন্মদিন। এছাড়াও জন্মাষ্টমী কিংবা ইউকেএসসি ফুটবল টিমের উদ্বোধন। এছাড়াও দেখা হত অন্যান্য অনুষ্ঠানেও। এমন আন্তরিক, স্বচ্ছ মনের মানুষ এ যুগে দুর্লভ। সমগ্র পরিবার, বন্ধু, আত্মীয়স্বজনকে এক সুতোয় কীভাবে গেঁথে রাখতে হয়, জানত মৌ। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আজকাল প্রকাশনা, মৌ–এর নজর সব দিকে। কে খেল না, কার বাড়ি পৌঁছোতে গাড়ি প্রয়োজন, হাঁকডাক দিয়ে ব্যবস্থা করে ফেলত। ওর মাখনরঙা ত্বক, গোলগাল পুতুল পুতুল চেহারা, দেখলেই মন ভাল হয়ে যেত।

রাজ্যপাট পড়ে রইল, রানি চলল অমৃতলোকের পথে। ঈশ্বরের ঘর গোছাতে ডাক পড়েছে যে, তাই চলে যেতে হল তাকে। শেষযাত্রায় প্লাবনের মতো মানুষ এসেছেন মৌ–এর জন্য। লাল টুকটুকে বেনারসি পরে মৌ শুয়ে আছে। এত অগণিত মানুষকে কাঁদিয়ে, এত মানুষের ভালবাসা নিয়ে চলে যেতে ক'জন পারে...?

মন ভাল নেই

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছি না। সোমবার সন্ধের পরে ঘন ঘন বজ্রপাতে শিউরে উঠছিল কলকাতা। তার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাজটা বিকট শব্দে আছড়ে পড়েছিল আমার কানে, রাত সাড়ে দশটায়।

একটা ফোন।

'তুমি কি জানো, মৌ ম্যাডাম খুব ক্রিটিক্যাল?'

অবিশ্বাস্য! বাজে কথা, হতে পারে না। কী বলছে আমার এই বন্ধু? মৌ যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক, সে আসলে তো আমার ছোট বোন, আমাদের পরিবার! এই তো ক'দিন আগে কথা হল, বলল, হাঁটু দেখাবে ডাক্তারকে, আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে, তারপর আড্ডা, কথাবার্তা হবে। তার মধ্যে লেখার তাগাদাও দিল। তার আগে ১৫ এপ্রিল দেখাও হল, নতুন ফুটবল ক্লাব উদ্বোধনের দিনে। আবার খানিক হাসাহাসি, হইহই।

নাহ্, প্রচেত জানাল, সত্যি। পারলে একবার যেতে।

মস্তিষ্ক মুহূর্তে অসাড়, বোধবুদ্ধি কাজ করছে না। না, শুধু আমি নই, চুমকি, আমার মেয়েরাও— সবাই বুদ্ধু, বিহ্বল।

তারপর চারজনে সেই গভীর রাতেই ছুটেছি হাসপাতালে... যখন রাত দুটোয় বেরোচ্ছি, সকলের একটাই প্রার্থনা, হে সর্বশক্তিমান, আজকের রাতটা পার করিয়ে দাও, ওকে ফিরিয়ে আনো। হয় তো, মিরাকল হয়! নিশ্চয়ই হবে, মৌ পারবে, পারবে ফিরে আসতে। ও তো মাত্র ৫৩, এমন খাঁটি সোনার মতো হৃদয়, এমন অফুরন্ত জীবনীশক্তি, ও তো যা চেয়েছে, করে দেখিয়েছে, এবারও পারবে।

নাহ্, রাত পেরোল, সকাল হল, মৌ ফিরল না। তারপর থেকে হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি। মাঝে মাঝে কানের মধ্যে বেজে উঠছে ওর আদুরে মধুর কণ্ঠ, 'এই যে দাদা, পরশু আসতে হবে কিন্তু', বা 'কী ব্যাপার, বই পাঠিয়েছ, সই

নিজের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে পাশে পেলেন প্রকাশক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঞ্জন দত্তকে

কোথায়?' বা 'এ কী, বইয়ে বউদি লিখেছ কেন? আমায় তো তুমি বউঠান ডাকো', বা 'শোনো, এবারের বইমেলায় আমাদের অনুষ্ঠান মনে আছে তো? কোনও কাজ রাখবে না, বলে দিলাম।'

মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই কতকাল আগের, ২০১৩ সালের কুষ্টিয়ার সার্কিট হাউসের রাত। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির শতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে সত্যমের উদ্যোগে আমরা সবাই বাংলাদেশে। ১৭ জানুয়ারি। পরের দিন আদরের ঋষি (দেবদূত)-র জন্মদিন। কেক কাটার পরে রাতভর ইন্দ্রনীল (সেন), শান্তনু-নবনীতা, সাহেব, বীথির সঙ্গে মৌ-এর একটানা গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত। কী যে ভাল গাইত মৌ, একেবারে যেন ওর বুকের ভেতর থেকে উঠে আসত।

কত কত স্মৃতি... চুমকি আর আমি নচিকেতাকে নিয়ে ওদের বাড়ি, রাত দেড়টা পর্যন্ত শুধু গান আর গান। সমরেশ মজুমদারকে নিয়ে আড্ডা, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আড্ডা। নিজের হাতে মাছের ঝোল রেঁধেছে মৌ, আলু-পটল দিয়ে কাতলা মাছ, আলু-পোস্ত, কচি পাঁঠার পাতলা ঝোল। এত অনন্ত ভালবাসা, এত আন্তরিক, এত খোলামেলা উদার মন, আবার তেমনই সত্যি কথা মুখের ওপর বলে দেওয়ার ঋজুতা— আমার কথা বাদ দিন, যারা ওর কাছে এসেছে, সবাই জানে।

এবারের পঁচিশে বৈশাখ কাটল অন্ধকারে। সব আনন্দ, সব গান, সব আলো শুষে নিয়ে চলে গেছে আমার ছোট বোন, গোলগাল মিষ্টি মেয়েটা। মৌ রায়চৌধুরী। মন ভাল নেই, মন ভাল নেই।

পারিবারিক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম

ডোনা গাঙ্গুলি

বিশ্বাস হয়নি শুরুতে, যখন জানতে পারলাম মৌ বউদি আর নেই। বেলা ১২টা নাগাদ জানতে পেরেছিলাম ওই মৃত্যুসংবাদ। কেউ কি মজা করে এমন একটা বাজে খবর রটাল? শুরুতে এমনই ভাবছিলাম। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, দেখি বন্ধুবান্ধবরা ওই একই খবর দিচ্ছে। মনখারাপের খবর। সোশ্যাল মিডিয়া ভেসে যাচ্ছিল পরের দুটো দিন শুধুমাত্র মৌ বউদির আকস্মিক প্রয়াণের খবরে।

মৃত্যু চিরকালই শোকের আবহ তৈরি করে থাকে। এক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই। ৫৩ বছর বয়সে তো এভাবে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু মৌ বউদিকে আমরা হারিয়ে ফেললাম।

বহু বছরের আলাপ। পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে বিশেষ সময় লাগেনি। তার কারণ, সত্যমদা এবং মৌ বউদি মানুষকে ভালবেসে কাছে টানতে জানে। আমরাও কিন্তু কখন যেন এক পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছিলাম। দেশে-বিদেশে তো গিয়েছি ওদের সঙ্গে। কীভাবে যেন একাত্ম হয়ে উঠেছিলাম। চলে যাওয়ার ১৫ দিন আগে মৌ বউদির সঙ্গে শেষ কথা। বলেছিল, 'অনেক দিন জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হয়নি। এবার একদিন সবাই মিলে আনন্দ করতে হবে।' আমাদের বাড়িতেই আড্ডা বসার কথা ছিল। সেটা যে এভাবে শুধু ভেস্তে যাবে তা নয়, এক করুণ পরিস্থিতি তৈরি করে নিঃশব্দে টা-টা বাইবাই করে চলে যাবে, এটা কল্পনাতীত।

একসঙ্গে অজস্র স্মৃতির ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

সৌরভ যেদিন নাগপুরে জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল, ওরাও হাজির ছিল। বাঙালির হৃদয়ে সেবার এতটাই উত্তাপ ছিল যে, সপরিবারে সত্যমদা-রা হাজির হয়ে গিয়েছিল নাগপুরে। দিনের খেলার শেষে রোজই বসত আড্ডা। এবং খেলা নিয়ে আলোচনা ছাড়াও অন্য বিষয়গুলো ওই আড্ডায় ভেসে উঠত। ছিল কলকাতা থেকে আসা জনা তিরিশ রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার। ওরা চাইছিল শেষ টেস্টের শেষ দিনে সৌরভকে সংবর্ধনা দিতে। ব্যাপারটা মৌ বউদির কানে যেতেই নিঃশব্দে একটা চমৎকার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দিয়েছিল। ভিন্‌রাজ্যে এরকম একটা অনুষ্ঠান চকিতে আয়োজন করে ফেলাটা সহজ ছিল না। কিন্তু কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে কী দারুণ ভাবে সেই একটি সন্ধে আমরা যাতে সবাই উপভোগ করতে পারি, সেই উদ্যোগটা নিয়েছিল মৌ বউদি। মনেপ্রাণে বাঙালি ছিল, সেটা নানা কথাবার্তা, লেখালেখি ও আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই কারণেই চমৎকার একটা পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে উঠতে বিশেষ সময় লাগেনি। আমি সত্যিই এক পারিবারিক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়ে আছি। একমাত্র প্রার্থনা, যেখানেই থাকুক, মৌ বউদি যেন নিজের মতো করে সাংস্কৃতিক জগৎটা সাজিয়ে-গুছিয়ে বসতে পারে।

অমলিন আলোর উজ্জ্বলতা

বীথি চট্টোপাধ্যায়

আমার সঙ্গে বহু বছরের স্নেহ–ভালবাসার সম্পর্ক। কবিতা লিখে অনেক সময় আমাকে পাঠিয়ে জানতে চাইত, কেমন লাগল? ওর ছিল অদম্য প্রাণপ্রাচুর্য; সেটা ওকে যারা চিনি সকলেই জানি।

কত লেখাই তো আমরা কত পত্রপত্রিকায় লিখি। কিন্তু আজ এই লেখা লিখতে বসে কলম সরছে না। এই লেখা আমাকে লিখতে হবে, এটা কি কোনও সুবিচার হল নিয়তির! বয়সে অনেক ছোট, উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল কেউ যদি চলে যায়, তখন কি তাকে নিয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছে করে? সেই জন্য অক্ষর শব্দ থমকে থমকে যাচ্ছে এ–লেখা লেখার সময়।

মৌ এমন অনেক কাজ করেছিল যে–সব কাজ বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গনে থেকে যাবে। আজকাল পুজোসংখ্যা, সুস্থ, সফর পত্রিকা মৌ–এর হাতে পড়ে নতুন করে জীবনীশক্তি পেয়েছিল। ওর ছিল সাবলীল নেতৃত্ব দেওয়ার ঋজু এক ক্ষমতা। আর জানত অত্যন্ত দক্ষভাবে টিমওয়ার্ক করতে। ওর সঙ্গে কাজ করলে কাজ হয়ে উঠত আনন্দ, সেটা নিছক পেশাগত গণ্ডিতে সীমিত থাকত না।

ওর প্রযোজিত ‘গোরস্থানে সাবধান’ সিনেমাটি অভাবনীয় সাফল্য পায়। ঘটনাচক্রে ছবিটির শুটিংয়ের কিছু সময় আমি দেখেছি সমস্ত ব্যবস্থাপনায় ওর একাগ্র তীক্ষ্ণ মনোযোগ।

সংসার থেকে পাবলিকেশন— সব কাজই একজন মানুষ এত দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে, এমন আমি বোধহয় আর দেখিনি।

ওর চলে যাওয়া নিয়ে কখনও কথা বলব না। সেই দুঃখ অন্তরেই থাকুক। যখনই ওর কথা বলব, কথা বলব ওর জীবন নিয়ে, কাজ নিয়ে। সব কিছু ছাপিয়ে ওর যে গুণটি ছোট–বড় সকলের কাছে শিক্ষণীয় সেটি হল, ও জানত কীভাবে এই ছোট জীবনটি আনন্দময় করে তোলা যায়।

বাঁচার টেকনিক ও শিখে নিয়েছিল কোনও মন্ত্রবলে। অনেকেই আমরা কোনও মতে টিকে থাকি। মনটা ভেতর থেকে মরে যায়। ও ওর মনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। প্রবলভাবে হাত ধরেছিল জীবনের। একেই বোধহয় বলে বাঁচার মতো বাঁচা। জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় উদ্‌যাপন করে বেঁচে থাকতে জানত সে। তাই তার চারদিকে ছিল উৎসবের রোশনাই। অমলিন আলোর উজ্জ্বলতা।

বাঙালির এক বিপুল কর্মযজ্ঞে ভরকেন্দ্র ছিলেন মৌ

সুবোধ সরকার

মৌ রায়চৌধুরী আমাদের বড়ো কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হননি এমন কোনও লেখক, শিল্পী ছিলেন না। তিনি সবার সঙ্গে মিশতেন, সবাইকে যোগ্য জায়গা দিতেন। তিনি নিজে লেখক বলে, লেখকদের সঙ্গে তিনি একাত্ম বোধ করতেন। সত্যম রায় চৌধুরীর পাশাপাশি মৌ রায় চৌধুরী একটি বিশিষ্ট নাম হিসেবে বাঙালি সমাজে উঠে এসেছিল। আমি তাঁর সুলিখিত গদ্য রচনা পড়েছি। আমি তাঁর কবিতা পড়েছি। তাঁর কবিতায় হৃদয় ছিল। মানুষের প্রতি ভালবাসা ছিল। কয়েকবছর আগে, আমেরিকাতে, বঙ্গ সম্মেলনে যে বছর আমি আজকাল-এন এ বি সি সম্মাননা পেয়েছিলাম, সেবার মৌ একশ দুই জ্বর নিয়ে যেভাবে শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, লড়াই করেছিলেন, সে দৃশ্য আমি ভুলবো না। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমি স্তব্ধ হয়ে আছি। এই শোক সহ্য করা যায় না। তাঁর সন্তপ্ত পরিবারের সবার পাশে আমরা আছি। বিশেষ করে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাল্ট ফিগার সত্যম রায় চৌধুরীর পাশে আমাদের সবাইকে দাঁড়াতে হবে। মৌ শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, বাঙালির এক বিপুল কর্মযজ্ঞে তিনি ছিলেন ভরকেন্দ্র।

বন্ধু

দেবযানী বসু কুমার

বন্ধু, তোমার কিসের এতো তাড়া ছিল?
সবাইকেই তো একদিন যেতেই হবে
তাই বলে তোমার এত বড় সাম্রাজ্যকে
অনাথ করে চলে যেতে পারলে?

বন্ধু, এমন অসময়ে তুমি চলে গেলে?
জীবনটা যে এখনও অনেক বাকি
তোমার এ বৃহত্তর সংসার যে
বোবা কান্নায় শোকে মুহ্যমান
থেমে গেছে সংসারের হাসি কান্না,
চুরি হয়ে গেছে সব হীরা পান্না

বন্ধু, তুমি থাকবে না? হবে না অংশীদার
জীবনের প্রতিটি সুর তাল ছন্দে?
আজ কাল পরশুর গল্পে
আমাদের লুকোচুরি খেলা চলত
তাই বলে উৎসবে, পালা পার্বনে,
আড্ডাতে তুমি থাকবে না?

বন্ধু, সংসার তরণীকে মাঝ দরিয়ায়
ভাসিয়ে কোথায় চলে গেলে?
মায়েদের কোল শূন্য করে
সন্তানের ভরসার মাস্তুলটা হেলিয়ে দিয়ে
তুমি কিছুতেই ভালো থাকতে পার না
ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে তোমার হাস্যময় ছবিগুলো
এখনও কী জীবন্ত

বন্ধু, তাই মন যে মানতে চায় না, তুমি নেই।।

ভালবাসার মানুষ হারিয়ে যাচ্ছেন

সুধাংশুশেখর দে

মৌ রায়চৌধুরীর অমায়িক, মধুর, আন্তরিক ব্যবহারের কথা সকলেই তো জানি। বছরভর নানা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকতাম। কিছু হলেই খোঁজ নিতেন। এই মাসখানেক আগে গেলাম, মাসিমার বইয়ের উদ্বোধনে। এত আমোদপ্রিয়, ভালবাসার মানুষ হারিয়ে যাচ্ছেন আমাদের জীবন থেকে। শোনার পর থেকে ভারাক্রান্ত। কী বলব? এখনও কিছু বুঝে উঠতেই পারছি না।

জীবন এত অনিত্য...

শ্রীজাত

এই তো সেদিন জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠান হল। এই দিনকয়েক আগেও আমাকে মেল করেছিলেন। পুজোসংখ্যার জন্য কবিতা চেয়েছিলেন। তাঁকে আজ দেখতে যাচ্ছি শায়িত অবস্থায়। এই অবিশ্বাস্যতা অতিক্রম করা মুশকিল। এত হাসিমুখ মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সকলের সঙ্গে তাঁর যত্নের, আদরের ব্যবহার ভোলার নয়। কত কাজের স্বপ্ন ছিল, তাতে আমাদের শামিল করতে চেয়েছিলেন। জীবন এত অনিত্য। ভাবতেই পারছি না।

মৌ–এর চলে যাওয়ায় এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হল

ডাঃ সুকুমার মুখার্জি

মৌ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ সত্যমের মাধ্যমেই। কয়েক বছর আগেই মৌ–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সরল–সাধাসিধে মৌ–কে আমার ভাল লেগেছিল মানুষ হিসেবে। ওঁর মধ্যে আমি একটা অনুপ্রেরণা দেখেছিলাম। পরে বুঝেছিলাম, বইয়ের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। 'সুস্থ', 'সফর', 'খেলার' মাধ্যমে বহু মানুষের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন। মৌ–এর লেখার জোর ছিল। আমি যত সেসব বই পড়ি, বোঝা যায় সাহিত্যের প্রতি বিশ্বাস ছিল অগাধ। শুধু কি তা–ই! মৌ ছিলেন সাক্ষাৎ 'গৃহলক্ষ্মী'। অসুস্থতা থাকলেও, আমার কিন্তু সবসময় ওঁর হাসিমুখটাই মনে পড়ে। সঙ্গে মনে পড়ে ওঁর দায়িত্বের কথা। মৌ–এর এই চলে যাওয়া আমার কাছে 'দুর্ঘটনা'। হঠাৎ করে চলে গেলেন। এমন একটা খবর জানলাম ফোনে! এটা বুঝতেই আমার অসুবিধে হচ্ছে এখনও। এটা ভাবা যায় না। মৌ–এর চলে যাওয়ায় এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হল।

আর কিছুদিন অপেক্ষা কর মা, আমার সঙ্গে দেখা হবে...

ডাঃ বি ডি মুখার্জি

মৌ সম্পর্কে এখন কিছু বলা, আসলে আমার কাছে বাবার মেয়ে সম্পর্কে অবিচুয়ারি লেখা। ওর সঙ্গে আমার পরিচয়-আলাপের কথা সকলেই জানে। যেদিন মৌ চলে গেল, আমি তখন হাসপাতালে। এখনও, কলমটুকুও সরছে না।

একটা ছোট, ফুটফুটে মেয়ে অনেক ছোট বয়সে আমার কাছে এসেছিল। অনেকগুলো শারীরিক সমস্যা ছিল। সব সামলে আমার হাতে জন্ম নিল ফুটফুটে এক ছেলে। সেই থেকে আর চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ক রইল না। তখন সত্যম আজকের সত্যম রায়চৌধুরী ছিল না, মৌ-ও ছিল বাড়ির বউ। দিনে দিনে ঋষি বড় হতে লাগল। তারপর থেকে এমন কোনও অনুষ্ঠান ছিল না, যেখানে আমি থাকিনি। শান্তিনিকেতন থেকে ঋষির জন্মদিন পালন, কত কিছু। 'কাবুলিওয়ালা' নাটককে সিনেম্যাটিক ফর্ম দিলাম। মৌ বলল, স্ক্রিনিং হবে এসএনইউ-তে।

নিজে হাজার সমস্যা নিয়েও, সবসময় হাসিমুখে ঘুরে বেড়াত। একেবারে অন্নপূর্ণা। সকলের খাওয়া হল কি হল না, সবদিকে নজর। ও কিন্তু আমাকে 'ডাক্তারবাবু' বলেই ডাকত। এর মাঝে ভাঙা পা নিয়ে চলে গেল পুরী। আমি বলতেই বলল, 'দেখুন না ডাক্তারবাবু, আমি জানতামও না। সত্যম টিকিট কেটে বলল, চলো, একটু পুজো দিয়ে আসি।' আমি তো সর্বঘটে কাঁঠালিকলা। ঋষির ক্লাব লঞ্চের অনুষ্ঠানেও গেলাম। দেখা হতেই সেই হইচই। আমি মৌ-কে বলতেই পারব না, 'যেখানে থাকো ভাল থেকো। আত্মা শান্তি পাক।' এটুকুই বলব, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর মা, আমার সঙ্গে দেখা হবে।

কখনও কখনও ভগবানকে নির্দয় মনে হয়...

ডাঃ শুভাশিস গাঙ্গুলি

মৌ রায়চৌধুরী, আমাদের সকলের প্রিয় মৌ। তাঁকে নিয়ে এরকম কিছু লিখতে হতে পারে আমি ভাবিনি। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে প্রায় ১০–১২ বছরের পরিচয়। প্রথম থেকে মৌ–এর সুন্দর ব্যবহার আর আন্তরিকতা আমার ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল এটা আমারও একটা পরিবার। কখনও মনে হয়নি আমি ওঁদের পরিবারে শুধু একজন চিকিৎসক হয়ে যাচ্ছি। পরিবারের সদস্যের মতোই গ্রহণ করেছিলেন। তারপর থেকে এত বছর কেটে গেছে। সারা বছর কখনও প্রয়োজনে, কখনও অকারণে আমাদের দেখা হয়েছে। মৌ খুব অল্প সময়ে মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। ওঁর কাছে যে কেউ সাহায্য চাইতে গেলে, সাহায্য করতেন নির্দ্বিধায়। চিকিৎসক হিসেবে দেখেছি, সব কথা শুনতেন, নিজেকে সুস্থ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। অথচ এত মিষ্টি, সুন্দর মনের একটা মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে। কখনও কখনও ভগবানকে খুব নির্দয় মনে হয়। যাঁরা এত ভাল, মানুষের এত ভাল করেন, তাঁদের কেন এত কম বয়সে ডেকে নেন?

ছিলেন নয়, থাকবেন... সবসময়

ডাঃ রামাদিত্য রায়

বউদি আক্ষরিক অর্থে ‘দাদার কীর্তি’র সন্ধ্যা রায় যেন। সত্যি উনি আমাদের মা, বড় বউদি সব রূপে ছিলেন। দাদার সব কাজের পেছনে, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষাও করতেন তিনি। দাদার বকুনি খেয়ে হয়তো মনখারাপ হল, ঘরে চলে গেলাম, বউদি সবটা বুঝতেন। হয় ঘরে ফোন পৌঁছোত, নয় নিজেই এসে পড়তেন। একেবারে দাদার সামনে নিয়ে যেতেন। তারপর তো হইচই। সে শান্তিনিকেতন হোক বা শিলাইদহ। আসলে সকলের মাথার ওপরে সুবিশাল ছাতার মতো ছিলেন বউদি। মনখারাপ থেকে পরামর্শ লাগবে, সব ক্ষেত্রেই বউদি ছিলেন।

ছিলেন না। থাকবেন। আমাদের সঙ্গে, আমাদের মধ্যে। সবসময়। মাথায় ছাতা হয়ে।

সাহিত্যের বলয়ে থাকা মানুষ, মন অন্যরকম হবেই

সৃঞ্জয় বসু

‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়’— মৌ রায়চৌধুরী এইভাবেই থেকে যাবেন সকলের হৃদয়ে। সংস্কৃতি জগতের যশসম্পন্ন সবার সঙ্গেই মৌ বউদির নিবিড় সংযোগ ছিল। তাঁর অকালপ্রয়াণে শোকান্বিত আমরা সবাই। এই বয়সে ওঁর চলে যাওয়া সত্যি মেনে নেওয়া যায় না। আরও কত কর্মযজ্ঞ বাকি ছিল যে!

শিল্প–সঙ্গীত–সাহিত্য জগৎ থেকে শুরু করে ওঁর প্রতিষ্ঠানের সকলের কাছের মানুষ ছিলেন বউদি। মৌ রায়চৌধুরীর আন্তরিক স্বভাবের প্রশংসা সকলের মুখে। বিনয়, নম্রতা ছিল ওঁর বড় গুণ। মুখে সদা হাসিটাই ছিল জনসংযোগের মূল মন্ত্র। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালেবাসা না থাকলে এটা অর্জন করা অসম্ভব।

সাহিত্যের প্রতি ওঁর গভীর অনুরাগ থেকেই একের পর এক ভাল কাজ করে গিয়েছেন। ‘আজকাল’ প্রকাশনার সম্পাদনা থেকে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো–চেয়ারপার্সন— সব ভূমিকাতেই হয়ে উঠেছেন নিজগুণে উজ্জ্বল। পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে। নিজস্ব ভাবনা ও ছন্দে লিখেছেন কবিতাও। সম্প্রতি ‘আজকাল ডট ইন’–এর দায়িত্বেও ছিলেন। নিজে হাতে শুরু করেছিলেন আজকাল পত্রিকার এই ডিজিটাল চ্যানেলটি। সেখানেও অনন্যতার ছোঁয়া। এছাড়া ‘আজকাল’ প্রকাশনের একজন কর্ণধার হিসেবেও নজির রেখেছেন নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। তবে এত কিছুর মধ্যে থেকেও নিজের সত্তাটি রেখেছিলেন মাটির কাছাকাছি। সকলের সঙ্গে নিজের মতো করে মিশে যেতেন। আপদে–বিপদে সকলের পাশে মৌ রায়চৌধুরী থাকবেনই। ঠিক যেন মমতাময়ী মা–বড়দিদির মতো।

আসলে সাহিত্যের বলয়ে থাকা মানুষ, তাঁর মন তো অন্যরকম হবেই। কী অদ্ভুত সমাপতন! রবীন্দ্রজয়ন্তীর ঠিক আগেই চলে গেলেন রবীন্দ্র–অনুরাগী মানুষটি। রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে বাঁচা, কতশত ঘরোয়া রবীন্দ্র অনুষ্ঠানের আয়োজক মৌ বউদির জন্য এবার পঁচিশে বৈশাখ অস্থির ছিলেন বাংলার শিল্পীরাও।

কাগজে ওঁর স্মৃতিচারণ পড়তে পড়তে মনটা আরও ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। মৌ রায়চৌধুরীর হঠাৎ করে সকলকে এই ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়া মন থেকে মানতে পারছি না। অনন্তের পথে ওঁর যাত্রা শান্তির হোক। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি এবং আজকাল পরিবারের এই ক্ষতি অপূরণীয়। মৌ বউদি, আপনি আমাদের সকলের স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। আমাদের মননে নদীর মতো বয়ে যাক আপনাকে ঘিরে থাকা স্মৃতিগুলো।

মৌবনী

গৌতম ভট্টাচার্য

সেই জুতো-চটির গহন জঙ্গলে নিজের জুতো জোড়াই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মিনিট পনেরো উদ্‌ভ্রান্ত খোঁজাখুঁজির মধ্যে একাধিকবার মনে হল মঠ-মন্দিরের বাইরে যেমন জুতো রাখার ঘর আছে। বিনিময়ে তারা টোকেন দেয়। এখানে সেই ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। কিন্তু কে করবে? কার পক্ষেই বা আন্দাজ করা সম্ভব ছিল এমন অকল্পনীয় দৃশ্যায়ন?

সল্ট লেক এফ ই ৪৯৮-এর ভেতরে লাল বেনারসিতে যে শান্তিতে শুয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে দ্রুত আমার কথা হল: মৌ তোমায় দেখতে গিয়ে আমার তো জুতো হারিয়ে যাচ্ছিল। কার না কারটা পরে চলে যাচ্ছিলাম।

মৌ: বলছ কী ! আমায় দেখতে এত ভিড় (ট্রেডমার্ক হাসি)! সত্যমবাবু কী বললেন?

দ্বিতীয় দৃশ্যটা দেখে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার মৌ-এর সঙ্গে কথা না বলে উপায় ছিল না। এবার চুল্লির সামনে ও অন্তিম সজ্জায়।

দেখা গেল তিনটে রো মৃতদেহ ঘিরে এমন জবজবে ভিড় তৈরি করে রেখেছে যে, বেচারি সত্যম সেই বেষ্টনী ফাঁক করে কীভাবে ঢুকবে

দ্বিধাগ্রস্ত ? ক্লাস নাইন থেকে শ্মশানে যাচ্ছি। ইদানীং একটা ধারণায় আচ্ছন্ন হতে শুরু করেছিলাম যে, ডিজিট্যাল যুগে মানুষের বোধহয় আবেগটাবেগ কমে গিয়েছে। শ্মশানে এমনভাবে যায়, যেন প্রেজেন্ট প্লিজ করতে এসেছে। বডি ভেতরে ঢুকে গেল কি অধিকাংশ কেটে পড়ল। যে দু-চারজন তখনও রয়েছে তারা কেউ কেউ ফেসবুক দেখছে। যদি ভেতরে ভিডিও করে থাকে তো সেটা চেক করছে। বা মমতা-মোদির সেটিং আছে কি না, তা নিয়ে দৃশ্যান্তরের আলোচনায় মগ্ন। অথচ এখানে তীব্র কান্নার আওয়াজ শুধু অনবরত পাওয়াই যাচ্ছে না—একজনও নড়ছে না। এমন গভীর মমতার সঙ্গে মৌ-কে ঘিরে দাঁড়িয়ে, যেন মাল্টিপ্লেক্সে পপকর্ন অর্ডার দিয়ে ডেলিভারির মনোহর অপেক্ষায়।

মৌ-কে আবার ধরলাম— করেছ কী ! ভাবতেই পারিনি এত ভালবাসে মানুষ তোমায় ! সীমাহীন বিদায়ী উচ্ছ্বাস তোমাকে ঘিরে ! রেকর্ড করে ফেললে তো !

এমনিতে মৌ অভিব্যক্তির ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কখনও নয়। বুফে কখনও নয়। আলা কার্ট।

মেনুতে স্ট্যান্ডার্ড চার-পাঁচরকম আইটেম ছিল ওর। হাসি, তীব্র অভিমান, রাগ, ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে নীরবতা আর চোখের জল।

আমি প্রথম আবেগটার সবচেয়ে বেশি সাক্ষাৎ পেয়েছি। ওর সবচেয়ে বড় গুণ— দুর্দান্ত সেন্স অফ হিউমারের অধিকারিণী ছাড়াও নিজেকে নিয়ে হাসতে পারত। যা ডোডো পাখির মতো জনজীবনে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে। চোদ্দো বছরে ব্লাড ক্যান্সার এবং উনত্রিশে ব্রেস্ট ক্যান্সারের মুখোমুখি কোনও 'রাজবধূ' হাসিমুখের অন্তরালে কঠিনতম লড়াই রেখে দিতে পারে, জাস্ট ভাবা যায় না!

শেষ বিকেলেও মৌ জবাবে হাসিই রেখে দিল, 'আমি তো ভাবতে পারছি না— লোকের হল কী গো ! পাপান কোথায় ছিল? একটু হালকা করেনি কেন? যাহ্, ওই ভিড়ে তোমার বা রায়াদির কষ্ট হয়নি তো?

কম্পোজ করতে করতে নিজেরই অবাক লাগছে। জীবনে গাদা গাদা শোকগাথা লিখেছি। কোথাও সদ্য মৃত চরিত্রের সঙ্গে কথোপকথনের কথা চিন্তাতেও আসেনি।

এখানে অনুভূতি অনিবার্য ভাবে এল, কারণ মৌ চলাফেরায় আপাত-নড়বড়ে হয়েও এমন জীবন্ত একজন মানুষ ছিল যে, তাকে ছবি বা মালায় গেঁথে রাখব কী করে? সে তো সারাক্ষণ এমন চোখের সামনে যে, ধাক্কাধাক্কি করে কাঠের ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসবে। তাছাড়া স্বামী-পরিবার সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গিয়েও যে মনে মনে চুঁচুড়ার মধ্যবিত্ত কিশোরী থেকে গিয়েছিল, সে কখনও ওভার দ্য টপ ব্যাপারে উৎসাহী হবে না, সেটাই তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক যে, জবরজং কিছু থেকে মৌ শতহস্ত দূরে থাকত। দেখানেপনা পছন্দ করত না। আশপাশের ভিড়ে কে চাটুকার, কে নয়— অনেকটাই বুঝত। মঞ্চে উঠেও মনে মনে নেপথ্যচারিণী থাকত। আর খুব নিভৃত পরোপকারী ছিল। মৌ-এর মুখাগ্নি মানে সমান্তরালভাবে একাধিক পরিবারে ছোট ছোট শখ-

ভালবাসারও মুখাগ্নি।

স্মরণিকায় যাঁরা লিখেছেন— সকলে জানেন, ব্যক্তিত্বটা ছিল পেছনে একটু সরে থাকার। বিশাল নাটক তৈরি করে সকলের চোখে-মনে-ভাবনায়-আলোচনায় টানা গেঁথে থাকা, এটা কখনও মৌ নয়। মেলোড্রামা জীবনে ধাওয়া করেনি। প্রচণ্ড জীবনসংগ্রামী এবং ক্যান্সার সার্ভাইভার হয়েও সেটা নিয়ে কখনও বিজ্ঞাপন করেনি। একটা আপাত-ঔদাসীন্য এবং ল্যাতপেতে ভাব ছিল। ঘনিষ্ঠরা জানত, ওটা মুখ এবং মুখোশ। অষ্টমীর রাত্তির বারোটায় যে বাগবাজার সর্বজনীন দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে। সেখান থেকে ঢুকে পড়ে শ্রীভূমির ভিড়ে। পায়ের ব্যথা নিয়ে অকুতোভয়ে দোহায় বিশ্বকাপ ফাইনাল -যাত্রী হয়ে যায়, সে আর যা-ই হোক টিপিক্যাল সখী সখী মার্কা নয়।

এখনও কেমন যেন ফিকশন মনে হচ্ছে যে, আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ ফাইনাল জেতার পর হুইল চেয়ারটা ছুড়ে ফেলে যে মেসিদের ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিল, সে কী করে কাঁধের ব্যথায় পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারে? কী হল অন্তরালে? শরীরের কিছু কলকব্জা আগে থেকে অকেজো ছিল? ভয়ঙ্কর চিকিৎসা বিভ্রাট? নাকি নিয়তি এত বড় উপকারী মনকে অন্য কোথাও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সরিয়ে নিয়ে গেল?

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে যার সঙ্গে হাসপাতালে বসে মেসিকে আবার দেখতে যাওয়ার প্ল্যানিং হল। যাকে অতীতে বড় বড় অসুস্থতা থেকে উঠে দাঁড়ানো রুটিন করে ফেলতে দেখেছি। কী করে জানব, সে দুম করে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে যাবে? আশ্চর্য তালিকার পয়লা। আশ্চর্য সিরিজে দুই, ঋষিকে এত চমৎকার ভাবে বহির্জগতের সামনে শোক আড়াল করে রাখতে দেখা। মায়ের সঙ্গে বরাবর ওর যে পর্যায়ের ঘনিষ্ঠতা, তাতে ভেতরে জল নয়, আমি নিশ্চিত, গলগল করে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। হয়েই চলেছে। তবু সবার সামনে ভেঙে পড়েনি । এত কম বয়েসে অনবদ্য মনের জোর। আর হাততালি দিয়ে ওঠার মতো মর্যাদাবোধ।

মৌ দেখলে চমৎকৃত হয়ে যেত— গ্যারান্টি। কে জানে, হয়তো কোথাও বসে তারিফও করছে।

কিন্তু তালিকায় তিন এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর তিন, শোকাহত প্রতিক্রিয়ার যে গভীরতা মৌ-এর মৃত্যু আহ্বান করেছে।

টানা দশ দিন ধরে রায়চৌধুরী বাড়িতে যেভাবে সকাল-সন্ধে-রাত্তির নাগাড়ে মানুষ এসেই যাচ্ছে। এটা শুধু বরেণ্য ব্যবসায়ী সংস্থার ওজনের জন্য হতে পারে না। এর একমাত্র ব্যাখ্যা, যে চলে গিয়েছে সে মানুষের মনে বিরাজ করেছে রায়চৌধুরী প্রাসাদের অবিরাম জ্বলতে-থাকা হার্টসাইন হিসেবে।

বর্ণ-ধর্ম-রোজগার-সংস্কার, সব কিছুকে ছাপিয়ে থেকে যাচ্ছে এবং যাবে মৌ-এর ব্যবহারিক মিষ্টত্ব। সেই ভালবাসায় আশ্রিত ছিল একটা বিশাল গোষ্ঠী। নিজেকে অবশ্যই মৌবনী নামক সেই অভয়ারণ্যের আধার কার্ড সমেত দেখি। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাকি জীবনও দেখব।

এমন সময়ে মৌ চলে গেল, যখন গিন্নিবান্নি থেকে পেশাদার সমাজে ওর জীবনের উড়ান সফলভাবে টেক অফ করে গিয়েছিল। যখন 'সুস্থ', 'সফর', 'খেলা', আজকাল পুজোসংখ্যা, আজকাল প্রকাশন, আজকাল ডিজিট্যাল— সব কিছুকে ও রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিতার পাশাপাশি ড্রয়িং রুমে স্থাপন করে ফেলেছিল। যখন সত্যমকে চমৎকৃত করে সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ওর মধুর যোগাযোগ আরও বাড়ছিল, তখনই আচমকা হাসতে হাসতে চলে গেল।

একেই বলে টপ ফর্মে সরে গিয়ে মানুষের মন থেকে আর কখনও না সরা।

ইদানীং আর মৌ-এর সঙ্গে কথা হচ্ছে না। সিস্টেম বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, ও চিরতরে নেই। আর কোনও দিন ওর সঙ্গে দেখা বা সেই বিখ্যাত হাসিটা শোনার সুযোগ হবে না। কী মর্মান্তিক উপলব্ধি !

দাদা হিসেবে একটাই সান্ত্বনা। জীবনে যতই গুটিয়ে পেছনের সারিতে গিয়ে বসুক, মৃত্যুর কালক্রম ওকে ফ্রন্ট রো-তে চিরজীবী করে দিল।

প্রথমে ভেবেছিলাম শেষ করব এই লাইনটা দিয়ে — সে ঢেউয়ের মতন ভেসে গেছে / চাঁদের আলোর দেশে গেছে। এত রোম্যান্টিক, বিষাদগ্রস্ত লাইন আর কী হতে পারে?

পরে মনে হল, না, যে রোগব্যাধি থেকে আসা জীবনের যন্ত্রণার সঙ্গে এমন অসামান্য লড়েছে। চূড়োয় থেকে এমন সফলভাবে যার অস্ত যাওয়া তার বিদায়সঙ্গীত অন্য কিছু হওয়া উচিত।

আমার আকুল জীবনমরণ / টুটিয়া লুটিয়ে নিয়ো / তোমার/ অতুল গৌরবে॥

হাসতে হাসতে হঠাৎ মৌ বিদায় নিল রঙ্গমঞ্চ থেকে

জয়ন্ত ঘোষাল

দিল্লির তাজ মান সিং হোটেল।
মধ্যাহ্ন ভোজনের অবসর।

শেফকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। খাবার অর্ডার দেওয়া হচ্ছে। সে এক লম্বা তালিকা। আমি বললাম, 'পাঁঠার মাংস খেতে বড় ভাল লাগে, কিন্তু খেতে ভয় পাই। চিকিৎসকরা নিষেধ করছেন, আরও নানান রকম দুশ্চিন্তা। তাই বরং মুরগিই খাই, পাঁঠা থাক।' সে বলল, 'ধুর! যেটা খেতে ভাল লাগে সেটাই খাবেন। যেটা করতে ইচ্ছে করছে সেটা করবেন। এত বাধা-নিষেধের জীবন আমার একদম পছন্দ নয়।' তারপর পাঁঠার মাংসেরই অর্ডার দেওয়া হল। নানা রকম ব্যঞ্জন।

সে এক মহাভোজ। অর্ডার দিচ্ছিল মৌ রায়চৌধুরী। পাশে উপবিষ্ট সত্যম। কিন্তু খাবার অর্ডার দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র মৌ-এর। যাই বলুন আর তাই বলুন, খেয়ে কিন্ত সেদিন খুব সুখ হয়েছিল। এরপর যখনই সত্যম-মৌ দিল্লি আসত, তখন মাঝেমধ্যেই এমন আড্ডা হত। আর আড্ডা বিনা ভোজন, এমনটা হতেই পারে না। আমি রসিকতা করে সত্যমকে বলতাম, 'তোমার সঙ্গে খেয়ে সুখ নেই, তুমি তো কিছুই খাও না! তোমার সঙ্গে বসলে লজ্জায় আমিও কিছু খেতে পারি না। কার্যত উপবাস করতে হয়। খেয়ে সুখ কিন্তু মৌ-এর সঙ্গে।' মৌ-এর জীবনদর্শনটা তখন জানতাম না। আসলে এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন যাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের সময়সীমাটা অল্প। কিন্তু সম্পর্কের গভীরতাটা সেই দৈর্ঘ্য প্রস্থ বর্গক্ষেত্রের পরিমাপ থেকে অনেক বেশি। আমার জীবনে মৌ ঠিক সেরকম একটি চরিত্র পরে জানলাম খুব ছোটবেলা থেকেই নানান অসুখে-বিসুখে ভুগেছে মৌ। ক্যান্সারের মতো ব্যাধিও বহন করে চলেছিল সারা জীবন। তবু সেই সব রোগভোগকে কখনও পরোয়া করেনি মৌ। যোদ্ধার মতো জীবনটার সঙ্গে লড়ে গেছে। হয়তো সেইজন্যই ওইরকম একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব ছিল ওর মধ্যে। কী হবে জীবনটাকে এত হিসেব-নিকেশের জপমালায় মধ্যে নিবদ্ধ করে?

অসম্ভব ভালবাসা দিয়ে জড়িয়ে রাখতে পারত মানুষকে। সে ছিল মৌ-এর এক অসাধারণ জীবনশৈলী। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার এক বাসিন্দা আমার পরিচিত, মৌ-এর মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে পড়ে বলল, 'ম্যাডাম চলে গেলেন?' আমি বললাম, 'তুমি চিনতে নাকি তাঁকে?' মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ। আসলে একবার ওঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলাম। অর্থাভাব। কেউ একজন বলেছিলেন, আর কাউকে নয়, ওঁর কাছে দরবার করো। অনেক কষ্টে ওঁর ফোন নম্বর জোগাড় করে আমি একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। আমাকে উনি চেনেন না, কিন্তু আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি তোমার চিকিৎসার খরচ দিয়ে দেব। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। আমি বিশ্বাসই করিনি, সত্যি সত্যি সেটা সম্ভব হবে। আমি ভেবেছিলাম, কোনও দিনই সেই মেসেজের উত্তর আসবে না। কিন্তু উনি আমাকে ফোন করেছিলেন এবং চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছিলেন।' এরকম অজস্র ঘটনার মিছিল। মৌ সে-সব কথা কাউকে জানাতে দিতে চাইত না। এখন মৃত্যুর পর দেখা যাচ্ছে, ওর ফোনবুকে বন্ধুর তালিকা ছ'হাজার জনের। সেই তালিকায় সমাজের কেষ্টবিষ্টু কম। বরং আছে প্রান্তিক মানুষ, যাদের আমরা চিনিই না।

দিল্লিতে বইমেলা। সত্যম সেই পুরনো দিল্লির কালীবাড়ির বইমেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আজকাল-এর মস্ত বড় স্টল দেওয়া হয়েছে। সত্যম-মৌ এসেছে সেই বইমেলায়। ওদের সঙ্গে চা-সহযোগে আড্ডা হচ্ছে। মৌ ওর লেখা কবিতার বই আমাকে উপহার দিল। আমি বললাম, 'সই করে দাও।' মৌ বলল, 'আপনাকে সই করে বই দিতে লজ্জা বোধ করছি। আমি কি আর কবি? আমি তো শখের কবি, শখের লেখিকা। ইচ্ছে করে তাই লিখি। নিজেকে বিরাট কোনও কবি মনেও করি না, আর কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার বাসনাও নেই।' মৌ তো ফেসবুকেও ছিল না। অথচ মৌ চলে যাওয়ার পর কত মানুষ যে ওকে নিয়ে কত পোস্ট করলেন, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

আসলে মানুষের জীবনের কর্মপ্রবাহের সমষ্টি নিয়েই তার ব্যক্তিত্ব, তার চরিত্র গড়ে ওঠে। মৌ-কে বন্ধু হিসেবে আরও অনেক দিন পাব, এমন আশা ছিল। বন্ধুত্বের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের ব্যাপ্তিও লাভ করব, এমন একটা লোভ ছিল। সেই ইচ্ছাপূরণ হল না। হাসতে হাসতে হঠাৎ মৌ বিদায় নিল রঙ্গমঞ্চ থেকে।

দর্শন বলে, শারীরিক অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মানসিক অবস্থিতি থেকে যায়। ভারতীয় ন্যায় দর্শনে অভাব একটা পদার্থ। তাই মৌ-এর অভাব একটা ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব নিয়ে সারা জীবন আমার সঙ্গে এবং আমার মতো বহু বহু মানুষের সঙ্গে থেকে যাবে।

পূর্বাশঙ্কা? প্রেমোনিশন?

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব কাছের ও ভালবাসার মানুষ যে, এবং অনুজ, তাকে নিয়ে কিছু লেখা, তার স্মরণে, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি বোধহয় আর কিছু হয় না। সেই মানুষের চলে যাওয়া, হুট করে, বিন্দুমাত্র আঁচ না দিয়ে, শরীর ও মনে কী প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করে, ৭ মে মঙ্গলবার, সাতসকালে টের পেলাম। গৌতম ভট্টাচার্যের মুখে 'মৌ নেই' শোনা মাত্র মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে উঠল। অবশ ও অবসন্ন আমি ধীরে ধীরে বিষাদে ডুবে গেলাম।

সেই থেকে ক্ষণে ক্ষণে অবিরাম ভাসতে শুরু করল মৌ-এর ঢলঢলে মুখ, তার মায়া-মাখা চোখ, মন-ভাল-করা নির্মল হাসি, অকৃত্রিম ভালবাসা, দরদি মন আর প্রবলভাবে আঁকড়ে-ধরা স্বভাব। মৌ, সত্যম ও ঋষির অজস্র অভিব্যক্তির কোলাজে আচ্ছন্ন হলাম। হবেই তো। প্রায় সিকি শতক ধরে সত্যম ও মৌ-এর আন্তরিকতা আমাকে রায়চৌধুরী পরিবারেরই তো একজন করে তুলেছিল। অবিচ্ছেদ্যও। এত বাঁধন ছিঁড়ে এভাবে চলে যেতে পারলে মৌ? ৫৩-তে?

অথচ এই সেদিন তোমার স্বরেই ঝরেছিল অনুযোগ ও অভিমান, যখন ফোনে বললে, 'কলকাতার রাস্তা কি ভুলে গেলে? কত দিন দেখা হয়নি বলো তো? চলো, প্ল্যান করি। সবাই মিলে কোথাও ঘুরে আসি দু-চারদিন। হাহা হিহি ক্লাব কতদিন এক হয়নি বলো তো?' আমাদের সম্মিলিত আড্ডা ওর ভাষায় ছিল 'হাহা হিহি ক্লাব'। আমাদের প্ল্যানেরও অন্ত ছিল না। আজকাল প্রকাশনের 'সুস্থ' ও 'সফর' ম্যাগাজিন কিংবা পুজোসংখ্যা অথবা টেকনো ইন্ডিয়ার টেবিল ক্যালেন্ডার কীভাবে আকর্ষণীয় ও অভিনব করা যায়, তা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনালাপে কাটিয়ে দিত মৌ। কিছু একটা লিখেছে। ছাপা হয়েছে কী হয়নি। ফোন। 'পড়ে বলবে পেরেছি কি না। তোমাকে বলি, কারণ জানি মন-রাখা কথা তুমি বলবে না।' ভাল কিছু লেখা, ভাল কিছু করার অসীম আগ্রহ, নিজের সবটুকু দিয়ে পারফেকশনে পৌঁছোনোর প্রবল তাগিদ মৌ-এর মধ্যে ছিল। আর ছিল একাগ্রতা। রবীন্দ্রনাথের গানে যখন ডুবে থাকত, শান্তনু সাহচর্যে, কোনও কোলাহল তখন তার সাধনায় বাধা হত না।

রবীন্দ্রনাথে শরণাগত মৌ-এর কবিতা ছিল প্রেম। গত বছর বইমেলায় বেরোনো 'মৌনমুখর' সই করে হাতে তুলে দিল। পরদিন বললাম, পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে এত বিষাদ কেন মৌ? কেন এমন চলে যাওয়ার আর্তি? গনগনে দুপুরে কেউ কি লেখে 'জীবন সীমার সময় হল শেষ', কিংবা 'হেরে গেলাম সকল ধরা বাজি' অথবা 'নাই বা রইলাম পৃথিবীতে যন্ত্রণা নিয়ে বুকে?'

মৌ হাসার চেষ্টা করেও চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। পূর্বাশঙ্কা? প্রেমোনিশন?

কর্মময় জীবনে ছেদ পড়ল অকালে

স্নেহাশিস সুর

আকস্মিক এবং অবিশ্বাস্য! এই বয়সে চলে যাবেন, কেউ কি তা ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিল? সবসময় মুখে একটা মিষ্টি হাসি লেগেই থাকত। আজকের দিনে যেখানে দাম্ভিকতাটা প্রতিষ্ঠিতদের সহজাত বলে ধরে নেওয়া হয়, সেখানে মৌ রায়চৌধুরী একেবারেই ব্যতিক্রমী। অল্প বা বেশি পরিচিত সকলের কাছেই সহজ-সরল, সাদাসিধে এমন একজন মানুষ, যাঁর একমাত্র পরিচয় তাঁর আন্তরিকতায়। কিছুদিন আগে এসআরসি-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলছিলাম, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে একটা জিনিস দেখেছি যে, সবাই হাসিমুখে এবং হইচই করে কাজ করে। দেশে, বিদেশে অনেক জায়গায় মৌ-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে, মূলত কোনও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরেই অথবা এসএনইউ-র কোনও অনুষ্ঠানে, সেখানে চোখে পড়েছে ওঁদের প্রতিষ্ঠানের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মৌ-এর উজ্জ্বল উপস্থিতি। যেন একটা বৃহত্তর পরিবার। আজকের কর্পোরেট দুনিয়ায় যা প্রায় অচল। এর কৃতিত্ব অনেকটাই বোধহয় মৌ-এরই পাওয়া উচিত।

একদিন জানলাম ছেলের বন্ধুদের নিয়ে গেছেন ওঁদের চুঁচুড়ার বাড়িতে। তাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছেন শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে, আদর করে সবার দেখভাল করেছেন শুধু নয়, আলাপও করেছেন তাদের সবার সঙ্গে। সেই দলে আমার ছেলে ছিল। তাই আমার কথা জেনেছেন। সময়টা পুজোর আগে, মনে করে ছেলের হাত দিয়ে আজকালের পুজোবার্ষিকী পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই যে শুধু ছেলে নয়, তার বন্ধুদের সঙ্গেও কোয়ালিটি সময় কাটানো, ওঁদের মতো জায়গায় গিয়ে এটা নিঃসন্দেহে বিরল ও ব্যতিক্রমী, আর সেজন্যই বোধহয় উনি আলাদা। তারপর যতবার দেখা হয়েছে, তা যত অল্প সময়েই হোক না কেন, এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টা সব সময়েই একান্ত আলাপচারিতা উঠে এসেছে। ওঁদের সংস্থার নিজ নিজ ক্ষেত্রের কর্মকাণ্ডের বাইরেও যে এত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি, তাতে ওঁরও একটা ভূমিকা আছে। সব কর্পোরেট সংস্থার এত সামাজিক ব্যাপ্তি হয় না। কত মানুষের আনাগোনা তাঁদের এতগুলো সংস্থাকে কেন্দ্র করে, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর একটা ব্যক্তিগত স্নেহ এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল, এটা ওঁর একটা বিরল প্রতিভা। যে এসএনইউ-তে এতবার দেখা হয়েছে সেখানেই সিস্টার নিবেদিতার ছবির নীচে তাঁর পার্থিব শরীর শায়িত। এই দৃশ্য কল্পনাতেও কখনও আসেনি। কিন্তু তা যে বাস্তব হয়ে দেখা দিল, তা আমাদেরই মেনে নিতে যদি এত কষ্ট হয়, তাহলে ওঁর নিকট জনের মনের অবস্থা কী হতে পারে! মৌ-এর এই কর্মময় জীবনে ছেদ পড়ল অকালে এবং আকস্মিকভাবে। শ্রদ্ধা জানাই এই জীবনকে, যা অগণিত মানুষের হৃদয়স্পর্শ করেছিল।

Mixing for a